

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রহস্যের দশ আঙুল



রহস্যের দশ আঙুল

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রহস্যের দশ আঙুল



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অগ্নিভ সেন

ROHOSYER DOSH ANGUL
Science Fiction *by* Abhijnan Roychowdhury
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-493-5

প্রিয় পাঠক
রাজর্ষি সরকার
ও
সোনাল দাস-কে
যাদের উৎসাহ, আগ্রহ, সমালোচনা আমাকে
নিরন্তর নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়।

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

সব লজিকের বাইরে
ক রহস্য
ভৌতিক অলৌকিক
মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন
সংকেত রহস্য
গ্লোবাল ওয়ার্মিং
রহস্য যখন ডারউইন

অনিলিখার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে কিশোর ভারতীর পাতায়। গল্পের নাম ছিল 'মিকুমুর গবেষণা'। তারপরে দুইদশক পেরিয়ে গেছে। অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস লেখা হয়ে গিয়েছে অনিলিখাকে নিয়ে। অনিলিখা পৌঁছে গেছে প্রায় সব বাঙালি পাঠকের কাছে। এমন অনেক পাঠকই আছে, যারা সারাবছর অনিলিখাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অপেক্ষায় থাকে। অনিলিখাকে ঘিরে এই উৎসাহ-অপেক্ষা আমাকে অবাক করে, উৎসাহিত করে প্রত্যেকবার এমন কিছু লেখার চেষ্টা করতে যা বিশ্ব সাহিত্যে এখনও লেখা হয়নি। তাই অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও একটা বা দুটোর বেশি উপন্যাস বছরে লিখে উঠতে পারি না।

এ বইয়ের দুটো উপন্যাসই অনিলিখাকে কেন্দ্র করে। 'রহস্যের দশ আঙুল' ও 'রহস্য যখন সংকেতে'।

ব্রিটেনের প্রেক্ষাপটে রহস্য উপন্যাস 'রহস্যের দশ আঙুল'। অনিলিখা এবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের শিকার। ওয়েলসের কেলটিক ম্যানর রিসরটে চারদিন বাদে খুন হবেন তিন দেশের প্রধান নেতা, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হবে অনিলিখাই। কোনও দোষ না করা সত্ত্বেও অনিলিখার নামের সঙ্গে যুক্ত হবে মোস্ট ওয়ান্টেড ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টের কলঙ্কিত শিরোপা। এর বেশি এখনই আর বলছি না। আর হ্যাঁ, অনিলিখার দশ আঙুলকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস।

'রহস্য যখন সংকেতে' উপন্যাসে অনিলিখার সঙ্গে মিস্টার পাইও আছেন। এর পিছনে আছে মৌলিক সংখ্যার রহস্য, আছে জেনেটিক রিসার্চ, আছে এনক্রিপশন, আছে আরও অনেক কিছু... যার কথা এখনই ফাঁস করে দিচ্ছি না। এখানে ঘটনা খোদ কলকাতার বুকে। একটা নয়, দুটো নয়, পর-পর ন-ন'টা খুন!!! আর খুনের সাক্ষী হিসাবে পড়ে থাকছে শুধু হতভাগ্যের কঙ্কাল। এই খুনের তদন্তে নেমে যখন রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন রাজর্ষি সরকারের মতন ফরেনসিক এক্সপার্ট, ঠিক তখনই তিনি পাশে পেয়ে গেলেন অনিলিখাকে। অনিলিখা কি পারবে এই জটিল রহস্য ভেদ করতে যেখানে অপরাধী কয়েকঘণ্টার মধ্যে কলকাতার বুকে খুব বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটানোর কথা আগাম জানিয়ে হুশিয়ারি দিয়েছে?

এই বইটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে যিনি মূল ভুমিকা গ্রহণ করেছেন আমার সেই প্রিয় সাহিত্যিক ও দাদা পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবদাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বউদি চুমকি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অনীশ দেবকে যাঁরা আমার উপরে ভরসা না রাখলে আমি এই উপন্যাসগুলো কোনওদিন লিখতে পারতাম না। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তোমাদের, যাদের আগ্রহ উদ্দীপনা আমাকে প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখায়, বাংলা থেকে এত দূরে থাকলেও বাংলাসাহিত্যে নতুন সৃষ্টির তাগাদা নিরন্তর যোগায়।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রেডিং, ইংল্যান্ড
১৯ নভেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র



রহস্যের দশ আঙুল



১। ১৬ নভেম্বর

ট্রেনটা বেশ খানিকক্ষণ সিগন্যালের অপেক্ষায় খোলা প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো মেঘের আড়ালে তারাভরা আকাশও উধাও। এমনিতেও এই সময় বিকেল পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে যায়।

বাইরে তাই পরিচয়হীন প্রান্তর, সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা রঙহীন পাহাড় উপত্যকা। ট্রেনের ভিতরেও ঠান্ডা হাওয়া খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। লংকোটের বোতামগুলো আবার আটকে নিচ্ছিল অনিলিখা। যে-কোনও পোশাকেই শেষ পর্যন্ত এই শীতের কাছে হার মানতে হয়।

—তোমার হাতের আঙুলগুলো খুব সুন্দর। এরকম আঙুল খুব কম দেখা যায়।

চমকে উঠল অনিলিখা। প্রশ্নটা এসেছে উল্টো দিকে বসে থাকা বৃদ্ধা মহিলার থেকে। দেখে একসময় খুব সুন্দরী ছিলেন বলে মনে হয়। ঘাড় অব্দি সাদা চুল। ধারালো নাক, চোখ, মুখ। মুখের চামড়া এখনও তেমন কুঁচকে যায়নি। ফরসা গালে গোলাপি আভা। একটা দামি নীল রঙের ড্রেসের উপরে থ্রিকোয়ার্টার হাতাওয়ালা সাদা সোয়েটার।

সামান্য হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা বলে উঠল—এর আগে অবশ্য অন্য কারুর মুখে আমার আঙুল নিয়ে এরকম প্রশংসা শুনিনি।

—কারণ তারা লক্ষ্য করে না। আমি করি। আর আঙুল দেখেই বুঝতে পারি কে কীরকম। আঙুলের ছাপেই তো তোমার সব পরিচয় থেকে যায়, তাই না?

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আপনি ফিঙ্গার প্রিন্ট-এর কথা বলছেন তো?

—ঠিক তাই। জানো তো, এর শুরু কিন্তু হয়েছিল ভারতে। 1853 সালে উইলিয়াম হারশেল বলে এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মী ভারতে চাকরি করতে যায়। ওই সময় নাগাদ বড় একটা সিপাহী বিদ্রোহ হয়। শেষে ইস্ট ইন্ডিয়ার হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেয় ব্রিটিশ রাজপরিবার। হারশেল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কাজ শুরু করে। গ্রামবাংলায় দায়িত্ব পায়। ওর তখন খুব কম বয়স। বছর পঁচিশেক হবে। ওদিকে ওই সময় সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ শাসকরা সাধারণের আস্থা হারিয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা তখন এতটাই ছিল যে কেউ রাজস্ব দিতে চাইত না, ইংরেজদের কর্মী হয়ে কাজ করতে চাইত না, ইচ্ছে করে দেরি করে কাজ করত। মূল উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনও উপায়ে ইংরেজদের জীবন ও তাদের রাজকার্যে বাধা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলা। তা সেই সময় কানাই বলে একজন একটা প্রোজেক্টে যন্ত্র সরবরাহের কাজ পেয়েছিল। তখন হারশেল তার হাতের ছাপ কন্ট্রাক্টে ব্যবহার করে, যাতে সে ঠিক সময়ে যন্ত্র সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

—কিন্তু হারশেল ওই আইডিয়াটা বোধহয় পেয়েছিল ভারতের সতীদাহ প্রথা থেকে। কারণ সতীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার আগে তার হাতের ছাপ লাল আলতায় ডুবিয়ে সে ছাপ রেখে দেওয়া হত।

—ঠিক বলেছ। তাহলেই ভাবো আমাদের এই আঙুল কতটা দরকারি! তা তুমি কোথা থেকে? ভারত না বাংলাদেশ?

—না, ভারত। কলকাতা। অবশ্য আমি যে ভাষায় কথা বলি সেই একই ভাষায় বাংলাদেশের লোকেরাও কথা বলে। বাংলা।

—তুমি একজনের সঙ্গে ফোনে বাংলায় খানিকক্ষণ কথা বলছিলে। তাই মনে হল। আরেকটা কথা বলি। তুমি যে লেখিকার বই এতক্ষণ পড়তে পড়তে আসছিলে, উনি আমার মা।

—বলেন কী? সুসান জেমস আপনার মা? উনি তো বিখ্যাত লেখিকা। ওনার মতো ভালো ক্রাইম থ্রিলার স্রষ্টা খুব কমই আছে। লেখায় দারুণ একটা ভিক্টোরিয়ান পরিবেশ তৈরি করেন উনি। এতক্ষণ ওনার লেখায় এমন বুঁদ হয়েছিলাম যে, ট্রেনেও এতটা সময় কীভাবে কেটে গেল টের পেলাম না। আপনিও কি লেখেন?

মুচকি হাসলেন বৃদ্ধা,—না, না। আমি মার মতো লেখার ক্ষমতা পাইনি।

—আপনি কী করেন?

—আমি সার্জেন। প্লাস্টিক সার্জারি আমার স্পেশালাইজেশন। এখন অবশ্য নিজে আর তেমন একটা অপারেশন করি না। আমার নাম সারা। একসময় আমার খুব জমজমাট প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছিল। বেশ কিছু জটিল অপারেশন আমার হাতেই হয়েছিল একসময়।

বৃদ্ধা একটু থেমে বলে উঠলেন,—ট্রেন যে কখন ছাড়বে কে জানে! আমার বাড়ি ব্রেকনে। নিউপোর্ট স্টেশন থেকে আরও দেড়ঘণ্টা লাগবে গাড়িতে। আমার ড্রাইভার ইতিমধ্যেই স্টেশন পৌঁছে গেছে।

এর মধ্যে ট্রেনে আবার ঘোষণা হল। ট্রেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। সিগন্যালের যে সমস্যা হয়েছিল ব্রিস্টলের কাছে, সেটা কেটে গেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অনিলিখা বলে উঠল,—যাক, ট্রেন তবে ছাড়ছে।

বৃদ্ধা ফের বলে উঠলেন,—আজ বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ১টা হয়ে যাবে। তোমারও সোয়ানসি পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় দেড়টা বাজবে।

—স্ট্রেঞ্জ! আপনি কী করে জানলেন, আমি সোয়ানসি যাচ্ছি?

—তোমার সিটের পিছনে সোয়ানসি অব্দি রিজার্ভেশনের কার্ডটা এখনও লাগানো আছে।

—বাহ! আপনার দৃষ্টিশক্তি তো দারুণ!

—হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু খারাপ হলেও এখনও বেশ ভালোই আছে। আমার মার পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমি কিছুটা পেয়েছি।—বৃদ্ধা একটু থেমে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে বলে উঠলেন,—এটা আমার কার্ড। এতে আমার ঠিকানা, ফোন নাম্বার আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে আমাদের পুরোনো বাড়ি। আমাদের বাড়ির একটা অংশ আমরা গেস্ট হাউস হিসেবে খুব কম ভাড়ায় দিই। চলে এসো একদিন। তোমার ভাড়া লাগবে না। আমি খুব লোক ভালোবাসি। অত বড় প্রপার্টিতে একা থাকতে ভালো লাগে না। মাঝেমধ্যে লোক এলে ভালো লাগে। এই শনিবার কী করছ?

—এই শনিবার আমার একটু কাজ আছে।

—রোববার?

—রোববার হতে পারে। সোমবার তো ছুটি আছে। একটু ভেবে দেখি। আপনার মা কি ওখানেই থাকতেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই ওনার যাবতীয় লেখার কাজ করতেন। আমার বাড়িতে এখনও সেই কনসারভেটরিটা একদম একইভাবে রাখা আছে, যেখানে বসে উনি ওনার বিখ্যাত নভেলগুলো লিখেছিলেন। ঠিক একইভাবে ওনার ঘরে ওনার প্রিয় চেয়ার, টেবিল, সোফা সব রাখা।

—তবে তো যেতেই হবে। উনি আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখিকা। তবে এত কম লিখেছেন।

—উনি আসলে লিখতে শুরু করেছিলেন অনেক পরে।

এসব কথার মধ্যে ট্রেন ছেড়েছিল। মিনিট কুড়ি বাদে ব্রিস্টল স্টেশন। তার আরও পঁচিশ মিনিট বাদে নিউপোর্ট স্টেশন। আর কোথাও ট্রেন দেরি করেনি। বৃদ্ধা নিউপোর্ট স্টেশনে নেমে গেলেন।

অনিলিখার ট্রেনে সোয়ানসি পৌঁছতে আরও এক ঘণ্টা লাগবে। তাই মাঝের সময়টা ও আবার সুসান জেমসের লেখা 'দ্য বয় হু নেভার কেম ব্যাক' অর্থাৎ 'যে ছেলেটা আর কোনওদিন ফিরে আসেনি'—বইতে নিবিষ্ট হল। অত বছর আগের লেখা। কিন্তু এখনও ভাষার মাধুর্যে, গল্পের প্লটে আর লেখার টানে পাঠককে বই নামিয়ে রাখতে দেয় না।

২। ২০ নভেম্বর

এত ব্যস্ততার মধ্যে কাজের বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তবে সুসান জেমসের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ তো ছাড়া যায় না।

ব্রেকন পাহাড়ি শহর। ওয়েলসের ব্রেকন পাহাড়ে যেতে হলে এই শহর হয়েই যেতে হয়। তাই যারা ট্রেক করতে আসে, তারা এখানেই আস্তানা গাড়ে।

সোয়ানসি থেকে গাড়িতে ব্রেকন দেড় ঘণ্টা লাগল। শহর পেরিয়ে একটু বাইরে বিশাল বাড়ি। বাড়ি শব্দটা উল্লেখ করলে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। ক্যাসলের আদলে প্রায় একশো একর জায়গা নিয়ে বাড়ি। বাড়ির মধ্যে একটা বড় পুকুর। তার পাশের রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলে আরেকটা গেট। গেটের পাশে সিকুইরিটি অফিস আছে। সারা আগেই অনিলিখার আসার কথা বলে রেখেছিলেন। ওখানেই গাড়ি রেখে খানিকটা হেঁটে নুড়ি পাথর ফেলা পথ পেরিয়ে গেস্ট হাউস। আরও খানিকটা এগোলে টিউডর গথিক স্টাইলের বিশাল বাড়ি।

ব্রেকফাস্ট করে এলেও গেস্ট হাউসে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে জিনিসপত্র রেখে সামান্য খাবার খেয়ে বাড়ির চারদিক দিয়ে একবার ঘুরে এলো অনিলিখা। বিশাল বড় এলাকা। বেশ সাজানো বাগান। দুটো ফোয়ারা আছে বাগানে। বেশ কিছু পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো।

বারোটার সময় এক মাঝবয়েসি মহিলা এসে অনিলিখাকে মূল বাড়িতে নিয়ে গেল। এ বাড়ির হাউসকিপার।

দেখেই বোঝা যায়, যে বাড়ির বর্তমান মালিকও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। তা না হলে এ বাড়ি ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য এত কর্মচারীও রাখা যায় না।

সারা ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছিলেন। ডাইনিং রুমটা বিশাল। দু-দিকেই দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা। দেওয়ালে নানান ধরনের পেন্টিং। মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছবিগুলো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের না হলেও বেশ ভালো।

বিশাল ওভাল শেপের টেবিলে নানান ধরনের খাবার সাজানো ছিল। নানান ধরনের স্যান্ডউইচ, স্যুপ, স্যালাড। সারা একটা কালো গাউনের উপরে কালো ফুলহাতা সোয়েটার পরে অনিলিখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মুখে-চোখে এমন আভিজাত্যের ছাপ সচরাচর দেখা যায় না।

অনিলিখাকে দেখে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে একগাল হেসে বলে উঠলেন,—আসতে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

—না, না। দেড় ঘণ্টা লাগল গাড়িতে। পথটাও খুব সুন্দর। দু-ধারে পাহাড়, উপত্যকা, ঘাসজমি। ছোট ছোট গ্রাম। এখানে না এলে সত্যি মিস করতাম। তা আপনাদের এই বাড়ি কতদিনের পুরোনো?

—ধরো, আমরাই চার প্রজন্ম ধরে আছি। আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের বাবার দিক থেকে এ বাড়িটা পান। প্রায় চারশ বছর পুরোনো। তাই নিয়মিত মেরামতি করতে হয়। অনেক সময় ঠিক সেরকম জিনিস পাওয়া শক্ত হয়। আমি আবার এমন কিছু করতে চাই না, যাতে এই বাড়ির অরিজিনাল চেহারা থেকে অন্যরকম কিছু হয়।

কথায় কথায় জানা গেল, সারার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে বেশ ধনী। শুধু তাই নয়, রাজ পরিবারের সঙ্গে লতায় পাতায় সম্পর্ক আছে। সুসান জেমস ওঁর লেখালেখির সূত্রে যথেষ্ট রোজগার করেছিলেন। তাই এ বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। সুসানের একমাত্র মেয়ে সারা। সারা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মেডিক্যাল

স্কুল থেকে পাস করে দীর্ঘ দিন ডাক্তারি করেন। ওনারও প্রাইভেট প্রাক্টিস বেশ ভালোই ছিল। এক মেয়ে। মেয়ে এখানেই থাকে। কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে তেমন কিছু বললেন না সারা।

লাঞ্চের পরে সারা বাড়ির খানিকটা অংশ ঘুরিয়ে দেখালেন অনিলিখাকে। বড় তিনতলা বাড়ি। ঘোরানো চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ওক আর পাইন দিয়ে বাড়ির ভিতরের মেঝে তৈরি। ঘরগুলোর ছাদেও ওকের বিম ব্যবহার করা হয়েছে।

সুসান জেমস দোতলার যে ঘরে থাকতেন, যেখানে পড়াশোনা করতেন, ওনার পছন্দের কনসারভেটরিতে যেখানে লেখালেখি করতেন, সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সারা। ঘরগুলো ঠিক একইরকমভাবে সাজানো আছে। বিশাল কাচের গোল কনসারভেটরি। কনসারভেটরি থেকে বাইরের ফোয়ারা, পুকুর খুব সুন্দর দেখা যায়। সামনেই একটা খুব সুন্দর ম্যাগনোলিয়া গাছ আছে। ফুলে ছাওয়া এত সুন্দর গাছের সামনে বসে উনি কীভাবে রহস্য খুনের প্লট ভাবতেন কে জানে!

ওনার ব্যবহৃত টাইপরাইটারটাও এখনও ঠিক একইভাবে রাখা আছে। ওনার লেখা সব নভেলের ফাস্ট এডিশন বুককেসে যত্ন করে সাজানো আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বিলিয়ার্ডস রুমে ঢুকল অনিলিখারা।

হঠাৎ উপর থেকে কোনও নারী কণ্ঠের চিৎকার। এমন রক্তজল করা সে চিৎকার, যে চমকে উঠেছিল অনিলিখা। মনে হল বাড়ির উপর দিকের কোনও ঘর থেকে এল।

সারা বলে উঠলেন,—ও আমার মেয়ের গলা। ওর শরীর সবসময় ভালো থাকে না। তখন ও মাঝেমধ্যে এরকম চিৎকার করে ওঠে। আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু এর কোনও চিকিৎসা নেই।

—উনি বাইরে বেরোন না?

—আগে বেরোত। কিন্তু এখন সবসময় প্রায় ঘরেই থাকে। মাঝেমধ্যে ও এক অন্য কল্পনার জগতে হারিয়ে যায়। তখন ভয় পেয়ে এরকম চিৎকার করে ওঠে। এমনিতেই আমাদের যা সম্পত্তি তাতে ওর তো আর রোজগার নিয়ে কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমি যথেষ্ট রেখে যাচ্ছি ওর জন্য।—সারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অনিলিখাও আর এ প্রসঙ্গে কথা বাড়াল না। বুঝতে পারছিল এটা বৃদ্ধার গভীর বেদনার জায়গা।

গল্প করতে করতে ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শীতের বিকেল। চারটেতে দিনের শেষ আলো দূরের গাছের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছিল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। মাথা তুলে বাড়ির দিকে তাকাতে অনিলিখা দেখল উপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হল জানলার কাছে কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে। ওদের লক্ষ্য করছে।

—এ বাড়ি কে তৈরি করেছিল জানো অনিলিখা?

—কে?

—থমাস হারপার। বিখ্যাত আর্কিটেক্ট। শুনেছি 1630 সালে প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ড খরচ হয়েছিল। বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। তবে এ-বাড়ির জায়গায় তার আগে অনেক পুরোনো একটা অ্যাবে ছিল। জানি না চার্চটা দেখেছ কিনা। ওটা অন্য দিকে। আমাদের প্রপার্টির মধ্যে। এখানে সেই চার্চের সঙ্গে যুক্ত সব মঙ্ক বা সন্ন্যাসীরা থাকত। সেটা অবশ্য হাজার বছর আগের কথা।

অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে বিকেলের শেষ আলোয় বাড়িটা দেখছিল। বাড়ি জুড়ে বেশ কয়েকটা টাওয়ার। বাড়ির কোনের দিকগুলোতে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য টারেট অর্থাৎ বড় টাওয়ারের উপরে আরেকটা ছোট গোল টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। টারেটের উপরে পাথরের পাখির মূর্তি পিনাকেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসবই টিউডর গথিক স্থাপত্যের অংশ। সারা পাশের বাগানগুলোতেও নিয়ে গেলেন। বাগান জুড়ে অনেক

কর্ক আর ইউ গাছ। বিভিন্ন দেশ থেকে নাম না জানা কিছু রেয়ার গাছ এনে লাগানো হয়েছে। অনিলিখার সবথেকে পছন্দ হল জাপানিজ গার্ডেনটা। সেখানে একটা জাপানিজ স্টাইলে টি-রুম আছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে সেখানে চা খেল। তারপরে সারা বাড়িতে ফিরে গেলেন। অনিলিখা গেস্টহাউসে।

সন্ধেবেলা গেস্টহাউসে ফিরে অনিলিখা বই পড়ছিল। ওর সেলফোন বেজে উঠল। সারা।

রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব। তুমি সাড়ে সাতটার সময় ডাইনিং রুমে চলে এসো। তোমাকে আমার মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

গেস্ট হাউসে এই সময় আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। একা এখানে ডাইনিং রুমে খাওয়ার থেকে সারার সঙ্গে সন্ধে কাটানোটা অনেক ভালো। তাই সওয়া সাতটা নাগাদ বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে গেল অনিলিখা। বাইরে এখন বেশ ভালো ঠান্ডা। হাওয়াও আছে। একটা ভারি লেদার লং কোট পরে বেরিয়ে এল অনিলিখা।

গেস্টহাউসের দায়িত্বে এক চাইনিজ মহিলা। বেরোতেই তার সঙ্গে দেখা হল। অনিলিখা রাতে বাড়িতে খাবে না, ও বাড়িতে খাবে জানাতে তার ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠল। কী কারণে কে জানে!

গেস্ট হাউস পেরিয়ে বাঁ-দিকে গেলে জাপানিজ গার্ডেনটা প্রথম পড়ে। সেটা পেরিয়ে নুড়িবাঁধানো পথ পেরিয়ে মূল বাড়ির দিকে এগোল অনিলিখা। এখন বাইরে বাগান জুড়ে ল্যাম্পের ঝিমিয়ে পড়া হলুদ আলো। দূর থেকে মূল বাড়িটার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যেন ওর উপরে আরও বেশি করে অন্ধকার নেমে এসেছে। বেশিরভাগ ঘরেই কোনও আলো জ্বলছে না।

বিশাল বিশাল কাচের জানলাগুলোর দু-একটা দিয়ে আলো আসছে। সেগুলো যেন রাতের অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো জ্বলছে।

মনে হল ওই বাড়ির তিনতলার একটা ঘরের জানলা যেন সামান্য খোলা। কেউ একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অনিলিখাকে লক্ষ্য করছে।

বাড়ির কাছাকাছি যেতে এক লম্বা চওড়া মহিলা এগিয়ে এলেন। মাঝবয়েসি। অনিলিখা এনাকে আগে দেখেনি। মেরি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে অনিলিখাকে ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। নানান রকমের ব্যবস্থা। স্যুপ, রোস্ট চিকেন, ফিশ পাই। সঙ্গে কিছু ভারতীয় খাবার আছে।

খাওয়ার পরে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে গল্প জুড়লেন। অনিলিখাকে একটা কম বয়সি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললেন, এটা কে বল তো?

অনিলিখা বলল—আপনার মায়ের ছবি। তবে অনেক কম বয়সের।

সারা একটু হেসে উঠে বললেন,—তোমাকে আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগের একটা গল্প শোনাই। তারপরে না হয় বলব এটা কার ছবি।

সারা বলতে শুরু করলেন।

—এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা। 1941 সালের জানুয়ারি মাস। সুসান জেমস তখন লন্ডনে। সেপ্টেম্বর 1940 থেকে জার্মানরা লন্ডনে বোমা ফেলতে শুরু করল। দিনে রাতে যে-কোনও সময় বোমারু বিমানের ঝাঁক উড়ে আসত লন্ডনের আকাশে। শিলাবৃষ্টির মতো নেমে আসত বোমা। মূল টার্গেট ছিল লন্ডনের ব্যবসার কেন্দ্রগুলো ও সেইসব জায়গা যেখানে বেশি লোক থাকার সম্ভাবনা। 1941 সাল শুরুর আগেই এ সব বোমায় প্রায় তেরো হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। অসংখ্য বাড়ি গুঁড়িয়ে গেছিল।

সরকার থেকে সবাইকে বলা হয়েছিল বড় শহরে না থেকে ছোট ছোট গ্রামে থাকতে। লন্ডন, ব্রিস্টল, বার্মিংহ্যামের মতো বড় শহরগুলো ছিল সহজ টার্গেট।

বাধ্য না হলে তাই কেউ সেই সময়ে লন্ডনে থাকত না। সুসান কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই লন্ডনে এসেছিল। সুসান ছিল একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স। সে সময়ে নার্সের দরকার ছিল সবথেকে বেশি।

—সুসান, মানে আপনার মায়ের কথাই বলছেন তো?—সুসান সম্বন্ধে যেভাবে সারা গল্পটা বলছিলেন, তার জন্যই অনিলিখাকে প্রশ্ন করতে হল।

সারা খানিকক্ষণ ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলেন অনিলিখার দিকে। তারপরে মুচকি হেসে ফের বলে উঠলেন,—সব যদি শুরুতেই বলে দিলাম তাহলে আর গল্প বলছি কেন? একটু ধৈর্য ধরো।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। যুদ্ধের সময় লন্ডনে নার্সদের খুব দরকার ছিল। সে জন্যেই সুসান এক দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে লন্ডনে এসেছিল। লন্ডনে প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে এক বাড়ি ভাড়া নেয় সুসান। সে বাড়িতে অন্য এক ভাড়াটে ছিল। নাম ছিল তার বেকি। সেও প্রায় সুসানের সমবয়েসি।

বেকি এসেছিল নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। ওর বাবা ছোটবেলায় মারা যায়। মায়ের কাছে মানুষ। অভাবের সংসার। খুব ভালো ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পরে আর পড়ার সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করে বেড়াত। কখনও বোমা তৈরির কারখানায় কাজ, কখনও হাউসকিপারের কাজ।

লন্ডনেও এসেছিল চাকরির সন্ধানে। একটা কাপড়ের কারখানায় কাজ করত। বেকি আর সুসান দুজন দুজনকে দেখে খুব অবাক হয়। ওদের দুজনের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত মিল। দুজনেই ব্লন্ড। মুখের আদলেও অনেক মিল। একইরকম রোগা। উচ্চতায় দুজনেই প্রায় সমান।

তবে দুজনের মধ্যে তফাত ছিল দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ডে, পড়াশোনায়, পছন্দে। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব থাকলেও সুসান অবাক হয়ে দেখত ও যা করে, বেকি তাই নকল করার চেষ্টা করে। সুসান যে ধরনের জামা পরবে, ঠিক সেরকমই জামা বেকি তার কিছুদিনের মধ্যে জোগাড় করে পরবে। সুসান যা খেতে পছন্দ করে, বেকি তা না ভালোবাসলেও ঠিক সেটা খাওয়ার অভ্যেস করার চেষ্টা করবে। সুসান যেভাবে কথা বলে, বেকিও যেন ঠিক সেভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে। একইরকম চুলের স্টাইল রাখে।

একদিন সুসান বিরক্ত হয়ে এ ব্যাপারে বেকিকে জিগ্যেসও করেছিল। বেকি উত্তর দিয়েছিল, সুসানই নাকি তার রোল মডেল। সুসান যেভাবে সবার সঙ্গে মিশতে পারে, সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে, সেটা নাকি বেকি শিখতে চায়।

যুদ্ধের জন্য সেসময় সব কিছুর সাপ্লাই ছিল সীমিত। খাবার, পোশাক—সব কিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল। একজনের জন্য সপ্তাহে একটা ডিম, 50 গ্রাম চা, 200 গ্রাম চিনি। এমনকী জামাকাপড়ের সাইজের উপরেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এসময়ে জামাকাপড়, খাবার শেয়ার করলে একটু সুবিধে হত। তাই সুসান এটা মেনে নিয়েছিল। ও জানতে পেরেছিল যে, ওর অজান্তে ওর কিছু পোশাক বেকি মাঝেমধ্যে পরে।

যুদ্ধের সময় মানুষ সব সময় বন্ধু খোঁজে, কথা বলার লোক খোঁজে। তাই ওদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। মাঝে মধ্যেই বিমান আক্রমণের আগাম সূচনা দিয়ে সাইরেন বেজে উঠত। আর বাড়িতে থাকলে দুজনেই তখন পড়ি কী মরি করে ছুটে গিয়ে মাটির নীচের অ্যান্ডারসন শেলটারে আশ্রয় নিত। যুদ্ধের আগে থেকেই লন্ডনের বেশিরভাগ বাড়িতে বোমা আক্রমণের থেকে বাঁচতে এরকম শেলটার তৈরি করা হয়েছিল।

সেরকমই এক ছুটির দিনে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। দুজনেই কোনওরকমে ছুটে গিয়ে মাটির নীচের ওই শেলটারে আশ্রয় নিল। ওখান থেকেই ওরা আওয়াজ পেল একঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে আসার। সে

আওয়াজের মধ্যেই একটা প্রবল বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ হল খুব কাছ থেকে। উপর থেকে মাটির ধস নেমে এল।

বেশ খানিকক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বেকি। জ্ঞান ফিরতে মাটি সরিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে এল। নানাজায়গায় কেটে ছড়ে গেছে, বোমার আঘাতে ছোট পাথরের টুকরো লেগে হাতে পায়ের নানান জায়গা দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বড় কিছু হয়নি। কিন্তু সুসানের ভাগ্য ভালো ছিল না। ওর উপরে মাটি পাথর এমনভাবে পড়েছিল যে তখনই সুসান মারা যায়। ওর দেহ পরে পুলিশ উদ্ধার করে।

—মানে! সুসান জেমস মারা যান? তাহলে ইনি কে?

সারা,—এটা হল আসল সুসান জেমসের ছবি। বেকির কাছে সুসানের সব ডিটেলস ছিল। সুসানের কোনও কিছুই ওর অজানা ছিল না। সুসানের ব্যাগ ও বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান জিনিসে সুসানের যাবতীয় পরিচয়পত্রও রাখা ছিল। বেকি এটাও জানত সুসানের খুব কাছের কোনও লোক জীবিত নেই। বেকি বুঝল, এটাই ওর কাছে একটা খুব বড় সুযোগ। উত্তরাধিকার সূত্রে একটা বিশাল সম্পত্তি পাওয়ার। একইসঙ্গে একটা বিখ্যাত পরিবারের অংশ হয়ে ওঠার স্বীকৃতি।

তাই সুসান মারা গেল না। মারা গেল বেকি। রাতারাতি বেকি হয়ে উঠল সুসান জেমস। সুসান এর পরে লন্ডন ছেড়ে ফিরে আসে এখানে, ব্রেকনে। মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পত্তি উপভোগ করতে। কাজ করার আর কোনও দরকার ছিল না।

এখানে আসার পর সময় কাটানোর জন্যও কিছু লেখালেখি শুরু করে। আস্তে আস্তে ওর লেখা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যতদিনে পঞ্চম নভেলটা শেষ করে, ততদিনে সুসান জেমসের নাম রহস্য লেখিকা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এই জনপ্রিয়তা খুব উপভোগ করলেও, কোথাও হয়ত মনের মধ্যে আক্ষেপ ছিল যে ওর আসল পরিচয় বেকি মিলারকে কেউ মনে রাখল না।

একটু থেমে সারা ফের বলে উঠলেন—তুমি যার লেখা পড়েছ, তা সবই আমার মায়ের অর্থাৎ বেকির।

কিন্তু এই আসল কথাটা তো কেউই জানে না! এটা মিডিয়া জানতে পারলে তো বড় রকমের হইচই পড়ে যাবে। পড়ার ঘরে, কনসারভেটরিতে যে ছবি দেখেছি, সবই কি বেকি মিলারের?

ঠিক তাই। তোমাকে দুজনের ছবি পাশাপাশি দেখাই। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কতটা মিল ছিল। অবশ্যই খুব প্রিয়জনেরা, বাবা বা মায়ের চোখে হয়তো পার্থক্যটা ধরা পড়ত। কিন্তু কয়েক বছর বাদে বেকি যখন সুসান হয়ে ফেরে তখন তাঁরা কেউই বেঁচে ছিলেন না, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের ওই সময়ে কারুর এসব নিয়ে প্রশ্ন করারও সময় ছিল না।

একটু আসছি—বলে সারা অন্য ঘরে গেলেন।

অনিলিখা অবাক! এত বড় অজানা রহস্য ওর কাছে হঠাৎ করে সারা কেন বললেন?

অনিলিখা স্ট্রবেরি আইসক্রিম খাচ্ছিল। খেতে খেতে কীরকম যেন তন্দ্রা আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন কীরকম নেশা হচ্ছে। ঘরের আলোগুলো আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছিল। একটা নীল আবছা আলো শুধু ছড়িয়ে পড়ছিল চোখের সামনে। ওর খাবারে কি কিছু মেশান ছিল?

খানিকবাদে দূর থেকে আবার সারার গলা শোনা গেল। সারা ফিরে এসেছেন। ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

কী? কেমন লাগছে? তখনকার দিনে রাতারাতি এরকম আরেকজনের পরিচয় নিয়ে নেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে তা যথেষ্ট কঠিন। তবে অসম্ভব নয়।—বলে ফের হেসে উঠলেন। কারুর হাসির মধ্যে যে এ ভাবে নিষ্ঠুরতা মিশে থাকতে পারে তা সারার হাসি না দেখলে অনিলিখা কোনওদিন টের পেত না।

অনিলিখা আর কথা বলার অবস্থায় ছিল না। জ্ঞান হারানোর পূর্বমুহূর্তে মনে হল সারার শেষ কথাগুলো যেন একটা গুহার দেওয়ালে বারবার ধাক্কা খেতে খেতে হারিয়ে গেল।

৩। কয়েক মাস আগে...৩ জুন

শনিবার। এই একটা দিনই বাড়ির সব কাজের জন্য রেখে দেয় জন। রোববারটা একদম নিজের ইচ্ছে মতো কাটাতে চায়।

জন অবাক হয়ে ক্রেডিট কার্ডের বিলটা দেখছিল। অনেক খরচের মধ্যে দু-একটা ছোট-ছোট খরচের উল্লেখ বিলে আছে, যার কথা ওর খেয়াল পড়ল না। এমনিতে ও এভাবে খুঁটিয়ে কখনও দেখে না। একা থাকে। মা ও বাবা দুজনেই বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। ও একটা নামকরা কনসাল্টিং কোম্পানিতে কাজ করে। যা পায়, তাতে এ-ধরনের বিল মিলিয়ে ছোটখাটো খরচের হিসেব দেখার কোনও প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু আজ প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

যদিও বিলে সব চেনা দোকানেরই নাম, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে সেদিন সেখানে কেনার কথা কিছুতেই মনে করতে পারল না। যেমন টেস্কো সুপারস্টোর থেকে 19 পাউন্ডের বিলটা। সামান্য খরচ। কিন্তু তারিখটাই সন্দেহজনক। সেদিন তো যদ্দুর মনে পড়ছে ও বার্মিংহ্যামে গিয়েছিল অফিসের কাজে। সেলফোনের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল জন।

জনের বাবার অ্যালজাইমার ছিল। বছর পঞ্চাশ যখন বয়স, তখন এর লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে। জনের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। পঞ্চাশে পা দিতে অনেক দেরি আছে। কিন্তু এরকম ভুলে যাওয়া আবার সেরকম কিছুর পূর্বাভাস নয় তো? আবার মনে করার চেষ্টা করল জন। সত্যি কি ওই দোকানে গিয়েছিল?

কিন্তু না। পরিষ্কার মনে আছে সেদিন ভোর ছ'টার ট্রেনে বারমিংহ্যামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল জন। ও অফিসের এক্সপেন্সের ফাইল খুলে দেখল। এই, এই তো—পরিষ্কার—সিট নাম্বার, তারিখ, সময় লেখা টিকিট। তারপরে এও মনে আছে ট্রেনটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল। 30 মিনিট পরে ব্রিস্টলের একটা ট্রেনে উঠে ব্রিস্টল থেকে আবার বার্মিংহ্যামের ট্রেন ধরেছিল। যে মিটিং-এর জন্য যাওয়া, সে মিটিং-এ জয়েন করতে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে ওই দিনেই কী করে বাথ শহরের একটা সুপারস্টোর থেকে ও কোনও কিছু কিনতে পারে! আরেকটু খেয়াল করতে ও রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। আরও দুটো দোকানের নাম আছে অন্য দুই দিনে, যেখানে ও গত একমাসে কখনও যায়নি। তাহলে কি ওর ক্রেডিট কার্ড চুরি হয়েছে? কেউ ওর কার্ড দিয়ে অন্য কিছু ইচ্ছেমতো কেনাকাটি করছে?

ছুটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বের করল। নাহ, ক্রেডিট কার্ড তো মানিব্যাগে ঠিকই আছে। আর এই কার্ডের ডিটেলস তো কারুর কাছে থাকার কথাও নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। ক্রেডিট কার্ডের নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে কার্ড ক্যান্সেল করতে হবে অবিলম্বে।

ফোন করতে করতে টিভি চালাল জন। বিবিসি-র ব্রেকিং নিউজ। রাত সাড়ে দশটা। খানিক আগেই লন্ডনে লন্ডন ব্রিজের কাছে একটা গাড়ি অনেক পথযাত্রীকে চাপা দিয়ে গেছে। কতজন মৃত বা আহত এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

একইসঙ্গে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে লন্ডন ব্রিজের কাছেই 'বরো' মার্কেটে বেশ কিছু পথচারীকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশ কিছু নিশ্চিত করে না বললেও বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে করা হচ্ছে এটা কোনও সন্ত্রাসবাদী হানা। খানিক আগেই বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর আওয়াজ পাওয়া গেছে। লন্ডন ব্রিজের কাছাকাছি বেশ খানিকটা জায়গায় পুলিশ যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার আশংকা করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে মৃতের সংখ্যা একাধিক। তবে সংখ্যা ঠিক কত, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

কীভাবে যে এ বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদকে থামানো যাবে কে জানে! সত্যি যদি এটা সন্ত্রাসবাদীদের কাজ হয়, তাহলে এরকম ঘটনা তো যেখানে যে কেউ ইচ্ছে মতো ঘটাতে পারে।

যে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, এখানে এরকম ছুরি তো যে-কোনও বড় স্টোরেই পাওয়া যায়। টেস্কোতেও।

একটা ফোন আসছে। অচেনা নাম্বার থেকে। ফোনটা ধরে বেশ খানিকক্ষণ 'হ্যালো, হ্যালো' বলে গেল জন। উল্টোদিক থেকে কিছু শোনা গেল না। এত রাতে ফোন!

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল জনের। যদি কেউ ওর ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করে থাকে, তাহলে সে কেন অত কম টাকার ট্রান্সাকশন করবে। কার্ডের যা লিমিট তাতে তো অনেক দামি কিছু কেনা যেত। অনেক বেশি টাকা তুলে ফেলা যেত। তার কাছে অন্য অনেক সুযোগও ছিল। অন্য কোনও কারণের জন্য এই কার্ডের তথ্য চুরি করা হয়নি তো?

ওর কার্ড দিয়ে সন্ত্রাসবাদের জন্য কোনও কাজ করা হয়নি তো? যেমন ছুরি। ছুরি কেনা হয়নি তো ওর কার্ড দিয়ে? সে ক্ষেত্রে সেই ছুরি পুলিশের হাতে গেলে কে ছুরি কিনেছিল সে তথ্য বার করতে ওদের এক ঘণ্টাও লাগবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই ছুরি কোন দোকান থেকে কেনা, কে কোন কার্ডে কিনেছে, সে তথ্য বার করে নিতে পারবে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল জনের।

আরেকবার নিশ্চিত হতে ক্রেডিট কার্ডের বাকি কেনাকাটার হিসেব দেখতে গিয়ে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করল। শেষ কয়েকদিনে ক্রেডিট কার্ডে কেনার হিসেব দেখতে গেলে অ্যাকাউন্টে দেখা সম্ভব। কিন্তু অ্যাকাউন্টসে ডিটেলস দেখার পরপরই ভয়ে উত্তেজনায় ওর চোখ যেন ঝাপসা হয়ে এল। দেখাচ্ছে আজ ওর কার্ডে লন্ডনের একটা হোটেলে থাকার জন্য পেমেন্ট করা হয়েছে। কেন্সিংটনের কাছে হিলটন হোটেল।

সে কী! তাহলে মনে যে আশংকা হচ্ছিল, যে সামান্য সম্ভাবনাটার কথা ও ভাবছিল, সেটাই কি সত্যি। ওর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কেউ ওকে এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, যাতে আসল অপরাধীর সন্ধান সহজে কেউ না পায়!

দু-মাস আগের ঘটনা। তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে ও সন্দেহ করছিল যে ও সব দরকারি চিঠিপত্র পাচ্ছে না। তারপরে একদিন তার প্রমাণ পেয়েছিল। যে চিঠি সকালে মেল বক্সে ছিল, ইচ্ছে করে বার করে নেয়নি পরে নেবে বলে, সন্ধেবেলা অফিস ফেরত বাড়ি ঢোকার সময় সে চিঠি পায়নি। এরকম কয়েকবার দেখার পরে ও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে বাড়ির বাইরের মেলবক্সটা পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু তাতে যে এই চিঠি চুরি সমস্যার সমাধান হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ও কখনই নিশ্চিত হয়নি।

ওকে কেউ অনেক আগের থেকে টার্গেট করেনি তো?

কিছু আগে পাওয়া ফোনটা কার ছিল? নাম্বারটা দেখাচ্ছে লন্ডনের। কেনই বা একবার ফোন করে ছেড়ে দেওয়া হল। একবার কাঁপা হাতে ফোন করল জন। নাম্বারটা কার যদি বোঝা যায়! কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। তাহলে কি ও এ-বাড়িতে আছে কিনা সেটা বোঝার জন্যই ওকে পুলিশ থেকে ফোন করেছিল?

মাথায় কিছুই ঢুকছিল না কী করবে! সামনের দেওয়াল ঘড়িটার কাঁটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল।

বসার ঘরে গিয়ে আবার টিভি চালাল জন। পুলিশ থেকে এখনও কোনও অফিসিয়াল খবর নেই। একজন সাংবাদিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘটনার ধারাভাষ্য দিচ্ছে। লোকটার আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত সাধারণ জনতা যাদের একটা বড় অংশ শনিবারের রাতে লন্ডনের এই এলাকার পাব ও রেস্টুরেন্টগুলোতে খেতে ও মজা করতে এসেছিল। এরকম যে একটা ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যাবে তা ভাবতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে আততায়ী তিনজনকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আরও অনেকে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ব্রিটিশ আর্মড পুলিশ বেশ খানিকটা এলাকা আলাদা করে ঘিরে রেখেছে। সাধারণ জনতা যারা ওই এলাকা থেকে বেরোচ্ছে, তাদের সবাইকে মাথার উপরে হাত তুলে

যেতে বলা হচ্ছে, যাতে ওদের মধ্যে কোনও আততায়ী মিশে থাকলে তাকে পুলিশ চট করে সনাক্ত করতে পারে।

মূল তিন টেররিস্টকে যখন মেরে ফেলেছে, তখন তাদের সনাক্তকরণ করতে নিশ্চয়ই এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। একইসঙ্গে তারা কোথায় ছিল, তাদের হোটেল বুকিং খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই পুলিশ বেশি সময় নেবে না।

হোটেলটার ফোন নাম্বার খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না। এটাই একমাত্র উপায় জানার যে ওর পরিচয় দিয়ে কেউ ছিল কিনা। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল যে ও গতকাল যে ঘরে ছিল সেখানে একটা দামি পেন ফেলে এসেছে। পেনটা পাওয়া গেছে কিনা সে প্রসঙ্গে ফোন করছে। রিসেপশনের মহিলা রেকর্ড অনুযায়ী ওর নাম খুঁজে পেতেই ওর সন্দেহটা যে একেবারে নির্ভুল প্রমাণ হয়ে গেল। কথায় কথায় বুঝল যে ওরা চারজন ছিল। চারটে রুম ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে একজন ওর পরিচয়ে ছিল। ওদের কাছে এখনও খুব সম্ভবত পুলিশ খবর নেয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জানতে পেরে যাবে যে ওদের হোটেলে উঠেছিল লন্ডনের চার টেররিস্ট। ফোনটা আর ধরে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল জন।

ও কি তাহলে ইতিমধ্যেই পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে? নাকি সন্ত্রাসবাদীরাই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। ওর তিন তলার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে উঁকি মারল জন। অনেক রাত। বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি দেখতে পেল না। ফিরে আসছিল। হঠাৎ খেয়াল করল দুটো গাড়ি আস্তে আস্তে ওর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে ও ঠিক করে নিল ওকে কী করতে হবে। ওর দরকার কিছুটা সময় যাতে ও প্রমাণ করতে পারে যে ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ও এর সঙ্গে কোনওরকমভাবে যুক্ত নয়। এখন এ ধরনের ঘটনায় একবার যখন ওর নাম জুড়ে গেছে, পুলিশ ওকে গুলি করতেও কোনওরকম দ্বিধা করবে না। সেখানে ওকে ওর পরিস্থিতি বোঝানোর সময় দেবে কিনা সন্দেহ।

ফোন আবার বাজছে। এ যেন মৃত্যু ওকে ডেকে চলেছে।

৪। ৩ জুন

এখানে পরপর একইরকম অনেকগুলো বাড়ি। জিপিএস-এ বাড়ির ঠিকানা দিলে এই এলাকায় নিয়ে আসে। কিন্তু দুটো বাড়ি আগের একটা বাড়িকে ওর বাড়ি বলে দেখায়। এর জন্য যে ওর একদিন পালাতে সুবিধে হবে একথা আগে কোনওদিন ভাবেনি জন। বাড়ির ড্রয়িংরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাগান। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল। বাগানের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরোনোর একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় এসে পৌঁছল। বাড়িতে যেটুকু টাকা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এনেছে ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ড। আরও একটু টাকা তুলে নিতে হবে।

কাল বাগান পরিষ্কারের কাজ হচ্ছিল বলে গাড়িটা একটু দূরে পাশের রাস্তায় রেখেছিল। বলা যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে গাড়িটা রেখেছিল। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে হেডলাইট না জ্বেলেই বেরিয়ে এল। পাড়া ছাড়ার পর হেডলাইট জ্বেলে স্পিড বাড়াল। যত তাড়াতাড়ি দূরে যাওয়া যায়। রাতের রাস্তায় গাড়ি খুব কম। শুধু হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তা ধরা দিচ্ছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে মোটরওয়ে ধরল।

ওয়েলসের দিকে লোকের ভিড় একটু কম। ওখানে একটা ছোট গ্রামে লুকিয়ে পড়া সব থেকে ভালো হবে। তাই ওদিকে যাওয়া ঠিক করল জন। খানিকবাদে মোটরওয়ে থেকে চেপস্টাও যাওয়ার এক্সিট নিয়ে এগিয়ে চলল। পথে একটা ছোট গ্রাম পড়ল। কারওয়েন্ট। এখানেই একটা ছোট হোটেলে রাত কাটিয়ে কাল

ঠিক করবে কোথায় যাবে! শনিবারের রাত। তাই এত রাতেও বেশ কিছু ছোট হোটেল রেস্টুরেন্ট খোলা আছে। একটা ছ'কামরার অনামী হোটেলে থাকা ঠিক করল জন।

হোটেলের ঘরে এসে ফোনের দিকে তাকাতেই দেখল মিসড কল। গাড়ি চালাচ্ছিল বলে আগে খেয়াল করেনি। রাজের। ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া যায়। দু-তিন মাস আগে একটা পাবে আলাপ হয়। একটা টেবিলে বসে খাচ্ছিল জন। তখন রাজ নিজেই এসে আলাপ শুরু করে। খুব ভালো বুদ্ধিমান ছেলে। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুদিন ওরা দেখা করেছে। একসঙ্গে ফুটবল, রাগবি ম্যাচ দেখেছে। রাজনীতি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক করেছে।

এমন কেউ কেউ থাকে যারা চট করে বন্ধু হয়ে যায়। রাজ সেরকম। পাঞ্জাবি। ওর বাবা 1980 সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে আসে। রাজের এখানেই জন্ম, এখানেই পড়াশোনা। একটা অ্যাকাউন্টান্সি ফার্মে কাজ করে। জন কিছু হিন্দিও শিখেছে ওর কাছ থেকে। ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। ও কী বলে জানা যাক। রাজ খুব বুদ্ধি রাখে। নিশ্চয়ই ভালো কিছু পরামর্শ দিতে পারবে। তবে অনেক রাত হয়েছে। দ্বিধা নিয়ে ফোন করল জন। কয়েকবার রিং হওয়ার পরেই রাজের গলা।

পুরো ঘটনা খুলে বলল জন। এটা বলতে পেরে ওর নিজের একটু হালকা লাগল। যে দমবন্ধ করা টেনশনটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেটা একটু কমল।

—তোমার উচিত সবার আগে এই ফোনটা ইমিডিয়েটলি ফেলে দেওয়া। তুমি এই হোটেলে কী পরিচয়ে উঠেছ?

—কেন? আমার পরিচয়ে।

—তুমি কি পাগল? এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। কেউ যদি পথে জিগ্যেস করে নাম বলো ডেভিড, বলবে থাকো সুইনডনে। আমি একজন ডেভিডকে চিনি যে আমার সঙ্গে কাজ করত। নিজের আসল পরিচয় এখন কোথাও দিও না। আর একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এখনই ওখানে চলে যাও। আমিও ওদের বলে রাখছি। ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

—কীভাবে? ওরা আবার কীভাবে সাহায্য করবে?

—ওরা তোমার অন্য কিছু পরিচয়ের ব্যবস্থা করবে, যাতে তুমি কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে পারো।...দাঁড়াও, তার আগে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। বাকিটা সামনাসামনি বলব।

দশমাইল দূরের একটা পেট্রোল পাম্পের অ্যাড্রেস দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল জন। গাড়ি ঝড়ের বেগে ছোটাল। সত্যি, এরকম না হলে বন্ধু!

৫। ৮ জুন

রোববার। শনিবারের বদলে এই সপ্তাহে আমরা রোববার সবাই মিট করব বলে ঠিক করেছিলাম। একটাই কারণ। অনিলিখাদিও আসতে পারবে। অনিলিখাদি অবশ্য এখনও আসেনি। সকাল-সকাল প্রতীকদের বাড়ি এসে বসে আছি। বিশ্বজিৎদাও আসবে না আসবে না করে ন'টা বাজতেই হাজির। তবে আজ জমজমাট আড্ডার সুর কেটে গেছে।

লন্ডনে আবার টেররিস্ট অ্যাটাক! টিভি চলছে।

টিভিতে খবর দেখার পরে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না। সারা বিশ্ব জুড়ে এই সন্ত্রাসবাদ কবে কমবে কে জানে! এখনও বিবিসি-তে দেখিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে কয়েক ঘণ্টা আগে লন্ডনে ফের টেররিস্ট হানা হয়েছে। খবরে বলছে শনিবারের রাতে লন্ডন ব্রিজে কয়েকজন টেররিস্ট একটা সাদা ভ্যান নিয়ে বেশ কয়েকজনের

উপর দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চালিয়ে দিয়েছে। তারপরে ওই ভ্যানে করে খানিক দূরে গিয়ে বরো মার্কেটে নেমে ওই টেররিস্টরা ছুরি দিয়ে যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই মারার চেষ্টা করেছে।

খবরে দেখাচ্ছে অন্তত সাতজন মারা গেছে। আটচল্লিশ জন আহত। ওই জায়গায় বেশ কিছু পাব-রেস্টুরেন্ট আছে। শনিবারের রাতে তাই অনেক লোকের ভিড় ছিল। জমজমাট উৎসবের পরিবেশ ছিল। টেররিস্টরা সে সুযোগ নিয়েছে। যাকে সামনে দেখেছে তাকেই মেরেছে।

যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছে। পুলিশ থেকে জানিয়েছে তিনজন টেররিস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনজনকেই ঘটনার খবর পাওয়ার আট মিনিটের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আর কোনও টেররিস্ট ঘটনাস্থলে নেই। তবে এখনও অনেকটা জায়গা পুলিশ ঘিরে রেখেছে। চিরুনি তল্লাশি চলছে। যদি কেউ কোথাও লুকিয়ে থাকে।

সবাই চুপ করে খবর শুনছিলাম। প্রতীক খবর দিয়েছে মাসিমা ঘিয়ের লুচি আর তরকারি করছেন। তার আশায় আছি। এরকম একটা খারাপ খবরের মন খারাপ করা ভাবটা যদি তাতে একটু হলেও কাটে।

নীরবতা কাটাতে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—বুঝলি, এই গরমে ভেবেছিলাম লন্ডনে যাব। কয়েকটা দিন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচগুলো দেখে আবার ফিরে আসব। শচিন এখন ওখানে আছে। একটু আড্ডাও মারা যেত। সে আর হল না।

—সে কি বিশ্বজিৎদা! তুমি আবার শচিনকে চিনলে কী করে?

বিশ্বজিৎদা খুব গম্ভীর মুখে সামনের টেবিলে রাখা চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলে উঠল—সে অনেক কথা। সেরকম তো অনেকের সঙ্গেই আলাপ আছে। কিন্তু সেসব কথা তো আর তোদেরকে বলা যাবে না। পাঁচকান করে বেড়াবি। শুধু সামনা সামনি কখনও দেখা হলে, কার কাছ থেকে শচিন অফস্পিন বোলিংটা শিখেছিল সেটা জিগ্যেস করে নিস।

আমরা হাই হাই করে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে উঠলাম। কিন্তু বিশ্বজিৎদার উত্তর দেওয়ার দরকার পড়ল না। কারণ অনিলিখাদির ইতিমধ্যে ঘরে আবির্ভাব ঘটেছে। গায়ে নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। খোলা উসকোখুসকো চুল। দেখেই বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে।

প্রতীক বলে উঠল—কী ব্যাপার অনিলিখাদি? এত দেরি? তোমার জন্য মা লুচি শুরু করতে পারছে না।

অনিলিখার যে ঘিয়ের লুচি বেজায় পছন্দ এটা আমরা সবাই জানি। অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—স্যরি। বেরোনোর সময় টিভি চালানোটাই ভুল হল। টিভি খুলতে দেখি এই কাণ্ড। এই কয়েকমাস আগে যখন লন্ডনে ছিলাম এই বরো মার্কেটের একটা পাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরেছি। সব চেনা জায়গা।

দেখো, সেসব বন্ধুদের মধ্যে আবার কেউ এসব টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত কিনা!—বিশ্বজিৎদা খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না।

—না, না। একজন বাদে আমার বন্ধুর লিস্টে সেরকম আর কেউ নেই। —বিশ্বজিৎদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল অনিলিখাদি।

তন্ময় বলল,—সত্যি এরকমভাবে টেররিস্টরা যদি মানুষ মারার পরিকল্পনা করে, তাহলে কোনও সরকার এসব ঘটনা আটকাবে কী করে? যে কেউ তো একটা বড় ছুরি ব্যাগে নিয়ে ঘুরতে পারে। কী করে আগে থেকে বুঝবে?

—এজন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য টেররিস্টের উপরে নজরদারি রাখা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটার আগেই অনেক ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্সের তথ্যের উপরে নির্ভর করে পুলিশ কাজ করে, যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা জানতেও পারি না। কিন্তু দু-একটা ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স এরকম মিস করলেই তা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায়। আমাদের পৃথিবীটা সত্যি দিন-কে-দিন তাই এত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

—আশা করা যায় সব ক'জনকেই পুলিশ ইতিমধ্যে মেরে ফেলেছে। খবরে তো তাই বলছে।—সহেলি বলে ওঠে।

—হয়তো ঘটনার সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত, তাদেরকে ধরেছে। তবে মনে রাখতে হবে এসব টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি হঠাৎ করে হয় না। এর সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকে যারা পিছনে থেকে প্ল্যান করে। অনেক ক্ষেত্রে তারাই কর্মকাণ্ডের আসল পাণ্ডা হয়। এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাজ হবে তাদেরকে খুঁজে বার করা।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল,—আমাকে হয়তো কয়েক মাস বাদে লন্ডন আর সেখান থেকে এডিনবরা যেতে হবে। কয়েক সপ্তাহ থাকব। তখন এসব জায়গায় গেলেই এই সব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসবে।

—অফিসের কাজে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। একটা কাজেই যেতে হচ্ছে। একটা কনফারেন্স আছে।

এর মধ্যে ঘরে লুচি এসে ঢুকল। আলোচনা আর বেশি এগোল না। কারণ অনিলিখাদিও লুচি দেখে মুহূর্তে প্লেটে মনোসংযোগ করল।

৬। ২০ জুলাই

বহুদিন বাদে একটা ছুটি নিল হ্যানা। ও অক্সফোর্ড সার্কাস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে স্টেশন-সুপারভাইজারের কাজ করে। দায়িত্বের কাজ।

স্টেশন চত্বর পরিষ্কার আছে কিনা, কোনও প্যাসেঞ্জারের কোনওরকম অসুবিধে হল কিনা সেটা দেখার থেকে শুরু করে স্টেশনে কন্ট্রাক্টররা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, মেন্টেনান্সের কাজ সব কিছু ঠিকভাবে এগোচ্ছে কিনা...সব কিছু দেখার দায়িত্বই হ্যানার। হ্যানা বিয়ে করেনি। ওর সব সময় জুড়ে শুধুই এই ট্রেন আর স্টেশন। নেশার মতো হয়ে গেছে।

একা থাকে। সকালে কফি নিয়ে সোফায় বসে সবে চুমুক দিয়েছে, সেলফোনটা বেজে উঠল। অফিস থেকে ফোন। সবার তো জানার কথা যে ও আজ বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে।

বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরল না। কফি কাপে চুমুক দিল। কিন্তু ফোন আবার বেজে উঠেছে। একই নাম্বার থেকে ফোন। ফোনটা ধরতেই উল্টো দিক থেকে ডিউটি স্টেশন ম্যানেজার পলের গলা ভেসে এল।

হ্যানা!—কাঁপা উত্তেজিত গলা পলের,—খবরটা পেয়েছ?

—কী?

—উল্টোদিক থেকে ফের পলের কথা ভেসে এল—এখনি এখানে চলে এসো। ঠিক দশ মিনিট আগে স্টেশনে একটা বড় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। অনেকে মারা গেছে। শিগগিরি চলে এসো। এখখনি।

বলো কী! বোমা বিস্ফোরণ? অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে? এটা লন্ডনের ব্যস্ততম স্টেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাও আবার এরকম পিক আওয়ারসে। এসময় অফিস যাত্রীর কীরকম ভিড় থাকে তা ভালোই জানে ও। মাথা যেন ঘুরে গেল হ্যানার।

গতকাল রাত দশটাতে ও স্টেশন থেকে বেরিয়েছে।

টিভি চালাল হ্যানা। খবরে সবে ব্রেকিং নিউজ এসেছে। ঠিক দশ মিনিট আগে অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে বড় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। কতজন হতাহত হয়েছে, বলা যাচ্ছে না।

কাল দক্ষিণের একটা এস্ক্যালেটরে একটা বড় কাজ হচ্ছিল। ও নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে কিছু হয়নি তো?

ওর ফোন বাজছে। ওর বন্ধু শোভির ফোন। শোভি অবশ্য ঠিক সহকর্মী নয়। কয়েকমাস আগে আলাপ। ফোনটা ধরতেই উল্টো দিক থেকে শোভির উত্তেজিত গলা।

—হ্যানা, হ্যানা! কী হয়েছে শুনেছ?

—হ্যাঁ! আমাকে ডিউটি স্টেশন ম্যানেজার পল এখনি জানিয়েছে। আমি যাচ্ছি।

—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। পুলিশ তোমাকে জেরা করবে। ওরা হয়তো তোমার খোঁজে ইতিমধ্যে বেরিয়েও গেছে। তুমি এখনই পালিয়ে যাও।

—কেন? আমার পালানোর কী আছে?

—আমি কাছাকাছি ছিলাম। জানতে পেরেছি পুলিশ নাকি তোমার এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কথা ভাবছে।

—কী! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী করে জানলে?

—এখন বেশি কথা বলতে পারছি না। তবে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। খানিক ভাবার সময় পেয়ে যাবে।

—কিন্তু যাব কোথায়?

—আমি সে ব্যবস্থা করেছি। বেরোলেই দেখবে তোমার বাড়ির বাইরে উল্টো দিকের রাস্তায় টেলিফোনের পাবলিক বুথটার কাছে একটা কালো অডি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যা পোশাকে আছ, তাতেই ওতে উঠে বোসো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো। লিফটে নেমো না।—ফোন ছেড়ে দিল শোভি।

মাথা কাজ করছে না হ্যানার। এখনও নাইট ড্রেসেই আছে। কোনওরকমে একটা জিনস আর টি-শার্ট গলিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল হ্যানা। পাঁচ তলায় ফ্ল্যাট। প্রায় ছুটে নীচে নেমে দেখল বাইরে খানিকটা দূরে একটা কালো অডি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ড্রাইভার ওকে দেখে হাত নাড়ল। বাঁদিকের দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে এল হ্যানা। গাড়িতে ড্রাইভারের সিটে একটা এশিয়ান লোক বসে আছে। উঠতে-না-উঠতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

100 মিটার যেতে-না-যেতে হ্যানা লক্ষ্য করল উল্টোদিক থেকে একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে ছুটে আসছে। বড় রাস্তার থেকে ওর ফ্ল্যাটের লেনে গিয়ে ঢুকল। তাহলে ওর ফ্ল্যাটেই হানা দিচ্ছে। ওর কি পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হল? ওকে কেন পুলিশ সন্দেহ করছে? শোভিই বা একথা জানল কী করে?

শোভির কথাই ঠিক। এরকম পরিস্থিতিতে পুলিশ যে-কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। সে কারণে একটু ভেবে নিয়ে তারপরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বোধহয় ভালো হবে।

ও শুধু সামনের ড্রাইভারকে জিগ্যেস করে উঠল,—কোথায় যাচ্ছি?

ড্রাইভার দক্ষিণ লন্ডনের একটা চেনা ফোর স্টার হোটেলের নাম উল্লেখ করে বলে উঠল,—শোভি সাহেব বলেছেন আপনার ফোনটা অফ করে রাখতে। ওরা ট্র্যাক করবে।

হ্যানা সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা অফ করে দিল। মাথা কাজ করছে না। এতদিন বাদে ছুটি নিল। এরকম একটা দিনের শুরু যে এভাবে হবে কে জানত?

৭। ২০ জুলাই

সারাদিন ঘরের বাইরে জোরে পায়ের আওয়াজ শুনে বারবার চমকে উঠেছে হ্যানা। তিনতলায় কোণের ঘর। আসার পর থেকে আর বেরোয়নি। শোভি ঘর থেকে বেরোতে বারণ করে দিয়েছে। কয়েকমাস আগে একটা পাবে শোভির সঙ্গে প্রথম আলাপ হ্যানার। আজ এই বিপদের দিনে এরকম একজন বন্ধু পাশে না পেলে কী যে হত!

ওর পরিচয় এখন অন্য। হোটেলে চেকইন করেছে টিনা নামে। গাড়ি থেকে নামার আগেই ড্রাইভার ওকে টিনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দিয়েছিল। কী করে কোথা থেকে টিনা নামের এই মহিলার

লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড শোভি জোগাড় করেছিল কে জানে! টিনার সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল আছে হ্যানার। তবে একটু খেয়াল করে দেখলেই তফাত বোঝা যায়। কিন্তু হোটেলে চেকইন করার সময় সেটা কেউ খুঁটিয়ে দেখে না।

হ্যানা এটুকু বুঝেছে, এর জন্যই হয়তো ও বাড়তি কয়েক ঘণ্টা পেয়েছে! ওকে একটা এক্সট্রা ফোনও দিয়েছে ড্রাইভার। এই ফোনেই ফোন করবে শোভি। হ্যানা নিজের ফোন বন্ধ করে রেখেছে।

টিভিতে এখনও সমানে বিবিসি-র খবরে দেখিয়ে যাচ্ছে। হতাহত একশোর উপরে। গত কয়েক ঘণ্টা লন্ডনের পুরো আন্ডার গ্রাউন্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ও MI5-কে নিয়ে 'কোব্রা' মিটিং করেছেন। কীভাবে এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় তা নিয়ে দফায় দফায় বিভিন্ন এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার মেরি খানিক আগে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন,—ভিতরের কারুর এর সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা আছে। তা না হলে এরকম বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হত না। যে-কোনও সময় টিভিতে নিজের ছবি দেখার আশঙ্কাটা হ্যানাকে টিভি বন্ধ করতে দিচ্ছে না।

হঠাৎ হ্যানা চমকে উঠল। একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসছে।

ফোনটা কাঁপা হাতে ধরতে উল্টো দিক থেকে শোভির কণ্ঠ।

—আমি খানিকক্ষণের মধ্যেই আসছি। রুমেই থেকো।

—আমি কি পুলিশের সঙ্গে কথা বলব?

—না, না। কোনও কথা বলতে যেও না। ওরা তোমাকেই সন্দেহ করছে। তোমাকে হয়তো এক্সপ্লেন করতেও সময় দেবে না।

—কিন্তু আমাকে সন্দেহের কারণ কী?

—এক, তুমি ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে এটা করার সুযোগ ছিল না। দুই, বোমাটা একটা টি-শার্টে জড়ানো ছিল। টি-শার্টটা তোমার।

—মানে? কী করে জানল?

—বোমাটা ওই টি-শার্টে জড়ানো ছিল সেটা ফরেনসিক এক্সপার্টরা টি-শার্টের ছেড়া টুকরো দেখে বলেছে। টি-শার্ট এর ছবি কম্পিউটার স্ক্রিনে তৈরি করার পর ও ছবি দেখে তোমার ডিউটি ম্যানেজার বলেছেন যে গত বছর ওটা তোমাকে অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল। ক্যান্সার রিসার্চ ফান্ডের জন্য তুমি সবচেয়ে বেশি অনুদান সংগ্রহ করেছিলে বলে।

—তুমি এত কিছু জানছ কী করে?

একটু চুপ থেকে শোভি বলে উঠল,—তুমি কি আমার পরিচয় জানতে চেয়েছ কখনও? এটুকু শুধু জানতে যে আমি একটা সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে কাজ করি। এটুকু বলি আমিও ওই তদন্তের দলেই আছি। তা না হলে এত কিছু জানতাম কী করে! নেহাত তুমি আমার বন্ধু বলে আর তোমাকে আমি নিরপরাধ বলে জানি বলে বলেছি।

একটু চুপ করে রইল হ্যানা। সত্যিই কোনওদিন শোভির পরিচয় জানা হয়নি। প্রশ্ন করলে শোভিও এড়িয়ে গেছে। হ্যানা বলল,—কিন্তু ওটা তো প্রায় চার সপ্তাহ আগে ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনে দান করে দিয়েছিলাম। তার মানে কেউ ওখান থেকে ওটা পরে সংগ্রহ করেছে।

—হতে পারে। তবে আমি এখন ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

ফোনটা ছেড়ে একটু ভাবতে বসল হ্যানা। তাহলে কি কেউ ইচ্ছে করে ওকে ফাঁসাতে চাইছে! বেশ কিছুদিন ধরে ফলো করছে? ওর পরে একই দোকানে গিয়ে ঠিক ওই টি-শার্টটাই কিনেছে। কিন্তু বোমা নিয়ে ভিতরে ঢুকল কী করে? অনেক প্রশ্ন, কিন্তু ওর সময় এখন খুব কম।

হ্যানা বুঝতে পারল মাকড়সার জালে ও আটকে গেছে।

৮। ২০ জুলাই

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্টিফেন তার টিম নিয়ে মিটিং করছিল। দশ ঘণ্টা আগে অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে বড় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এর মধ্যেই তদন্ত অনেক এগিয়েছে। এখানে যে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে তা শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু তদন্ত যত এগিয়েছে তত একজনের দিকেই সব প্রমাণ এগিয়েছে। হ্যানা মার্শাল। ওই স্টেশনের সুপারভাইজার। আজই ছুটিতে। কী সুন্দর অ্যালিবাই। ঘটনার পরে খবর দেওয়ার পর থেকে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালবেলায় ফোন করে আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই বেপাত্তা। যদি কোনওভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত না থাকত তবে অবশ্যই আসত।

গত কয়েকদিন স্টেশনের একটা এসক্যালেটর সারানোর কাজ হচ্ছিল। গতকাল অনেক রাত অব্দি কন্ট্রাক্টররা কাজ করেছে। সেখানেই একটা ব্যাগের মধ্যে বোমাটা ছিল। আর বোমাটা জড়ানো ছিল একটা টি-শার্টে। সে টি-শার্ট যে হ্যানার, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

বোমার মধ্যে ষড়ভূজ নাট ও লোহার টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে খানিক আগে হ্যানার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা নাট ও লোহার টুকরোর কেমিক্যাল কম্পোজিশন মেলে কিনা তা টেস্ট করার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। এই মাত্র ল্যাব রিপোর্ট এসে গেছে। একদম এক রাসায়নিক গঠন। আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটাই আশ্চর্য, হ্যানার অতীতে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। বাবা স্কটিশ, মা ইংল্যান্ডের। প্রোফাইল চেক করলে সন্দেহ করার কোনও কারণই থাকে না। যদি শেষে প্রমাণিত হয় যে হ্যানাই এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাহলে প্রথম প্রশ্নই হবে ও কী কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটাল? অন্য কোনও অফিসিয়াল কারণ? কারুর উপরে প্রতিশোধ?

এর মধ্যে আরেকটা খবর নিয়ে এল চিফ ইন্সপেক্টর বব। এই তদন্তের মূল দায়িত্ব সব ববেরই উপরে। যা সন্দেহ করা হচ্ছিল, ঠিক তাই। আজ ছুটিতে থাকলেও ভোর ছ'টার সময় হ্যানা ওর স্পেশাল অ্যাক্সেস ব্যবহার করে স্টেশন চত্বরে ঢুকেছে। আর তার ঠিক মিনিট পনেরো বাদে আবার বেরিয়ে গেছে। মাঝে কোথায় কখন গিয়েছিল তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এস্ক্যালেটরের কাছের সিসিটিভি ক্যামেরাটা আবার খারাপ। সেটাও যে প্ল্যান করে আগে থেকেই খারাপ করা হয়েছে, সেটাও নিঃসন্দেহে।

জীবিত বা মৃত যে-কোনও অবস্থায় হ্যানাকে দ্রুত ধরতে হবে। তা না হলে ওর কাছে লন্ডন আন্ডার গ্রাউন্ডের উপরে যা তথ্য আছে, তা দিয়ে এরকম আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটানো কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সাংবাদিকদের সামনা সামনি হতে হবে। সাধারণ জনতাকে কীভাবে আশ্বস্ত করা যায় এটাই ভাবছিল স্টিফেন। এর মধ্যে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। উল্টোদিকের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল স্টিফেন।

—কী হ্যানার খোঁজ পাওয়া গেছে? কোথায়? অন্য নামে আছে?

খবর এসেছে হ্যানা অন্য নামে একটা হোটেল ভাড়া নিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পরপর কয়েকটা ফোন করল স্টিফেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে হোটেল ঘিরে ফেলা হবে।

৯। ২০ জুলাই

হ্যানা বুঝতে পারছিল না কী করবে। ওর বন্ধু বলতে তেমন কেউ কোনওদিনই ছিল না। সেভাবে কারুর সঙ্গে আড্ডাও কোনওদিন মারেনি ও। শুধু কাজ আর কাজ। গ্র্যাজুয়েশনের পর থেকে সেই যে এই কাজে ঢুকেছিল, তারপর থেকে কখনও চাকরিও পরিবর্তন করেনি গত পনেরো বছর।

ওর মতো দক্ষ সুপারভাইজার যে খুব কমই হয়, এটা ওর শত্রুরাও স্বীকার করে নেবে। ওর কাজের রেকর্ড নিশ্চয়ই পুলিশও খুঁটিয়ে দেখবে। এরকম করার কোনও ইচ্ছে থাকলে কি এতদিন এই দপ্তরে এভাবে কাজ করতে পারত, এরকম একটা পরিস্থিতিতে যে ও কখনও পড়বে তা কোনওদিন ভাবতেও পারেনি। ওর কি পালিয়ে আসাটা ঠিক হয়েছে?

কিছু কিছু জিনিস এখন ওর মনে পড়ছে যেটা গত কয়েক সপ্তাহে ওর স্বাভাবিক লাগেনি। মাঝেমধ্যে ওর মনে হত, যেন কেউ ওকে নজর করছে।

গত পরশু পোস্টে একটা বড় বাক্স প্যাকেজ হিসেবে পেয়েছিল।

নেওয়ার পরে প্যাকেজ খুলে বেশ অবাক হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু নাট, বোল্ট আরও অনেক মেরামতির সরঞ্জাম ছিল। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষে ঘরে রেখে দিয়েছিল। প্যাকেজে ওর নাম, ঠিকানা ঠিকই ছিল। কিন্তু প্রেরক যে কে, বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল পরে একদিন পোস্টঅফিসে গিয়ে খোঁজ করে ঠিক জায়গায় ফেরত দিয়ে আসবে। সে সময় হয়ে ওঠেনি।

এছাড়া কয়েকদিন আগে ওর মনে হয়েছিল ওর ই-মেইল আইডি যেন হ্যাক করা হয়েছে। লগে দেখেছিল যে ওর কিছু ই-মেইল একটা অন্য আই পি অ্যাড্রেস থেকে পাঠানো হয়েছে। অথচ ও তো একই কম্পিউটার থেকে ই-মেইল সবসময় করে।

এ ছাড়াও ওর মনে হয়েছিল এমন কিছু ই-মেইল এসেছে যা দেখে মনে হয় ওর অন্য কিছু ব্যাঙ্ক জাতীয় দরকারি তথ্য বার করার চেষ্টা হয়েছে ওর ই-মেইলের সাহায্য দিয়ে। তখন এটা নিয়ে বেশি ভাবেনি, কারণ এরকম কোনও সম্ভাবনার কথাই ওর মাথায় আসেনি। মনে হয়েছিল ওর ইমেল আইডি থেকে কেউ যেন কিছু মেইল করেছে। কিন্তু সেই ই-মেইলগুলো খুঁজে পায়নি। তাহলে কি কেউ ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছিল গত কয়েকমাস ধরে?

হঠাৎ ওর মনে হল, বাইরের দরজার সামনে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার দিকে একটু এগোতেই বাইরে থেকে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনল।

ইতিমধ্যে আবার ফোন বাজছে। একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন। দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফোন ধরল। ফোন ধরতেই আবার শোভির গলা।

—পালাও হ্যানা। ওরা তোমাকে ঘিরে ফেলেছে।

—কীভাবে পালাব?

—ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ফোন কেটে গেল। হ্যানার মাথা কাজ করছিল না। তিনতলার উপরে ঘর। পুরোনো দিনের বাড়ি। পরে পরিবর্তন করে হোটেল হয়েছে। কাচের জানলা টেনে উপরে তুলে ফেলা যায়। তাতে দেড় ফুট মতো জায়গা হয়। কোনওরকমে তা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করল হ্যানা।

ইতিমধ্যে বাইরের দরজায় জোর ধাক্কার আওয়াজ। মনে হল দরজা যেন এখনই ভেঙে ফেলবে। তাড়াহুড়ো করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনতলার কারনিশে। নীচে রাস্তা আর সেখানে বেশ কিছু পুলিশ আগে থেকেই মোতায়েন ছিল। কী করবে বুঝতে পারার আগেই বেশ কিছু গুলি ওর দিকে ছুটে এল। তিনতলা থেকে নীচে মাটিতে এসে পড়ল শরীর। ছুটে এল কিছু পুলিশ। না, প্রাণ নেই। স্পট ডেড।

১০। ১৫ অক্টোবর

ইমিগ্রেশনের এত বড় লাইন আগে কখনও দেখেনি অনিলিখা। খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। আসলে গত কয়েক মাসে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হানা হয়েছে ইংল্যান্ডের বুকে। কখনও লন্ডন, কখনও ম্যাঞ্চেস্টার, কখনও কার্ডিফ। প্রত্যেকটাই ঘটেছে জনবহুল জায়গায়। তাই অনেক বেশি সতর্কভাবে তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তরের উপর নির্ভর করে বিচার করা হচ্ছে যে-কোনও নতুন আগন্তুককে। কোনওরকম সন্দেহ হলেই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

অনিলিখা ইংল্যান্ডে বহুবার আগে এসেছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকার কথা সিস্টেমে। তার উপর নির্ভর করে অনেক তথ্যই ওদের কাছে থাকবে। তবু হাজারো প্রশ্ন। এবারে কী জন্য, কতদিনের জন্য, কোথায় থাকবে...ইত্যাদি। যে আফ্রিকান মহিলা কাউন্টারে ছিলেন মাঝে একবার কী একটা জিগ্যেস করতে আরেকজনের কাছে গিয়ে আবার দু-মিনিট পরে ফিরে এলেন। সব মিলিয়ে অনিলিখা যখন বেরোল, তখন লন্ডন থেকে সোয়ান্সী যাওয়ার কানেক্টিং বাস মিস হয়ে গেছে। আবার এক ঘণ্টা পরে বাস। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না। তাই ভেতরে এসে টারমিনাল 3-এর সেন্ট্রাল বাস স্টেশনে বসল অনিলিখা। খানিকদূর দিয়ে একজন স্যুট টাই পরা ভদ্রলোক হেঁটে গেল। ভারতীয়। খানিকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ অনিলিখার মনে হল লোকটা যেন খুব চেনা। সুভদ্র সেন না?

একসঙ্গে বহু বছর আগে সাউথ পয়েন্টে পড়েছে। কী করছে এখানে? একটু দ্বিধা নিয়েই অনিলিখা চেঁচিয়ে উঠল,—সুভদ্র!

—অনিলিখা!! তুই এখানে?

—অফিসের কাজে এসেছি। একমাসের জন্য।

—তাই নাকি! গ্রেট।

—তুই?

—আমি এখানেই থাকি। অনেক বছর।

—কী কাজে আছিস?

—এটাই তো। আমার কাজটা এমন যে চট করে বলা যায় না। তবে ধরে নে আমি এখানকার লোকেদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করি।

—তার মানে ইদানীং যা অবস্থা তাতে বেশ চাপে আছিস। তাই তো?

হ্যাঁ, আর বলতে! যা চলছে, অন্য কিছু ভাবার সময়ই পাচ্ছি না। সব ছুটি ক্যান্সেল।...তুই একদিন আমার বাড়ি চলে আয়। রেডিং। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

খসখস করে একটা কাগজের উপরে ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখে অনিলিখার হাতে দিয়ে দিল। বলল, —আজ এখনই একটা কাজে ছুটতে হবে। তাই আর কথা বলছি না। তুই কি একা এসেছিস? তোর নাম, ঠিকানাটাও দিয়ে রাখ।

অনিলিখা ওর হোটেলের ঠিকানা, ফোনের নাম্বার লিখে দিল। কাগজটা নিয়ে সুভদ্র আর দাঁড়াল না। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

সুভদ্র সেন। বহুবছর বাদে দেখা। খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে ছিল। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। সব সময় নানা চালাকি করত। নিয়ম ভাঙতে ওস্তাদ। ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে গিয়ে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সঙ্গে আড্ডা দিত। সবাইকে বোকা বানাতে ওস্তাদ। তবে সবার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি আলাপ জুড়তে পারত। এটাই ছিল ওর স্পেশাল ক্ষমতা। দাবাও খেলত চমৎকার।

এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এটা ভাবতে পারেনি অনিলিখা। হঠাৎ ওর মনে পড়ল দেশে থাকতে কয়েক বছর আগে কী একটা ব্যাপারে যেন নামটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। ও একটা ছোট দলের মধ্যে

ছিল যারা রুলেট খেলা নিয়ে ক্যাসিনোতে কিছু জালিয়াতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরে অবশ্য ওদের শাস্তি পেতে হয়নি।

রুলেট খেলায় রুলেটের টেবিল আর বল উল্টোদিকে ঘোরে। তাই কোন ঘরে গিয়ে সেই বল শেষে পড়বে এটা কিছুতে বলা সম্ভব নয়। আর বেটিং হয় কোন ঘরে পড়বে তার সংখ্যা, সে ঘরের রং কী হবে—এসবের সম্ভাবনা নিয়ে। তাই আইনস্টাইনও বলেছিলেন যে রুলেট খেলা নিয়ে প্রেডিকশান কখনও সম্ভব নয়। প্ল্যান করে জেতা সম্ভব নয়।

কিন্তু ওই তিন জনের টিম সেটাই সম্ভব করেছিল। আর তাই বারবার কোনও এক অজানা টেকনিকের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ক্যাসিনোতে রুলেট খেলায় কোটি-কোটি টাকা জিতত। ধরা পড়লেও ওদের শাস্তি হয়নি। দেখা গিয়েছিল যে ওরা নিজেদের তৈরি রুলেট টেবিলে কম্পিউটার ও লেসার টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে কোথায় গিয়ে বল পড়বে সেটা বারবার করে পর্যবেক্ষণ করত। এভাবে বারবার দেখে ব্রেনকে এমনভাবে ট্রেন করেছিল যে নির্ভুল অনুমান করতে পারত। কিন্তু ক্যাসিনোতে রুলেট খেলার সময় কোনও কিছুর সাহায্য নিত না। শুধু সেই অভ্যেসের উপর নির্ভর করে সঠিক অনুমান করত। তাই ধরা পড়লেও আইন ভাঙেনি। কোনও শাস্তিও পেতে হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই তখন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

খুব প্রতিভাবান বলেই এটা ওর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে একবার সুভদ্রর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

১১। ১৬ অক্টোবর

এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি ব্রিটেনে। একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলা। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বারবার হামলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জনবহুল শহরে। বেশ কিছু ধরপাকড় হলেও যার দিকে প্রধান সন্দেহের আঙুল উঠেছে, সেই মূল অভিযুক্তই বারবার যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে খুঁজে বের করা যাচ্ছে না।

আগে সন্দেহভাজন দুষ্কৃতির প্রোফাইল চেক করে অনেক হামলা আটকানো যেত। ধর্ম, পরিবার, কোন দেশ থেকে এসেছে, কীরকম বয়স, ক্রিমিনাল রেকর্ড, উগ্রবাদে বিশ্বাস...এসবের ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুষ্কৃতিদের উপরে নজরদারি করা সম্ভব হত। এক্ষেত্রে যেন কার কাছ থেকে যে আক্রমণ আসবে সেটার ধারণাই করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকবারে মূল অভিযুক্তের চরিত্র আলাদা। ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা। আগে থেকে সন্দেহ করা অসম্ভব। যারা করেছে তারা প্রত্যেকেই যেন ভেতরের লোক। তাদের কাছে এতটাই তথ্য বা নিয়ম ভাঙার ক্ষমতা ছিল যে তাদেরকে আটকানো যায় না।

সামনে আবার ব্রিস্টলে ইউনাইটেড নেশনসের ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দেশের নেতারা আসবেন। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কুড়ি মানুষ। সবরকম সাবধানতা আগে থেকে নেওয়া হলেও সেই কড়াকড়ির ফাঁক গলে যে-কোনও টেররিস্ট চলে আসবে না সেটাই বা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

বিভিন্ন দেশের নেতারা থাকবেন কাছের নিউপোর্টের কেলটিক ম্যানর রিসর্ট হোটেলে। প্রশ্ন উঠছে তাদের নিরাপত্তায়। কীভাবে MI5 তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। যারা এসব নেতাদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবেন, তাদের প্রত্যেকের প্রোফাইল খুব সতর্কভাবে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এনিয়ে MI5-এর একটা বড় টিম কাজ করছে।

MI5-এর অফিসার রুনির দায়িত্ব পড়েছে এরকম এক মহিলার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার। ভারত থেকে আসছে। বাঙালি। নাম অনিলিখা। কনফারেন্সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর তার জন্য বাতাসের গতিপথ কীভাবে

পরিবর্তন হচ্ছে, এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবে। বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাদা কথা বলবে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এ মহিলার একটা ইন্টারেস্টিং অতীত আছে। বেশ কিছু বিশ্বজোড়া রহস্য সন্ধানে এই মহিলা যুক্ত ছিল। MI5-এর চোখে এই মহিলা অত্যন্ত প্রতিভাবান। তাই খারাপ কিছু করতে চাইলে, তারও ক্ষমতা রাখে। চোখের দৃষ্টিতেও সেই ইনটেলিজেন্সেরই ছাপ। রুনি অনিলিখার ছবির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই সুন্দরী মহিলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

১২। ২২ অক্টোবর

কয়েকমাস আগে এই মহিলার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ অনিলিখার। নাম কোর্টনি। আমেরিকায় থাকেন।

অনিলিখা খুব কম সময় ফেসবুকে থাকে। এমনকী অন্যদের রাখা ইনবক্সে মেসেজের উত্তরও পাঠাতে পারে না। দেখেও না খেয়াল করে। কিন্তু প্রথম থেকেই এই মহিলাকে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে অনিলিখার। এখন কোর্টনির থেকে আসা মেসেজ ইনবক্সে না দেখলে সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়।

কারণ উনি অন্য কোনও কথা তেমন বলেন না। শুধু একটা করে দাবার চাল দেন। আর অনিলিখা তার পরে উল্টো চাল দেয়। এটা যে রোজ হয় তা ও না। এমনও হয়েছে যে মহিলা সপ্তাহে একটাই চাল দিয়েছেন।

দাবা অনিলিখার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। ও অনেক টুর্নামেন্টও জিতেছে। ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু এরকম মজার খেলা আগে কারুর সঙ্গে খেলেনি। যে খেলা কয়েকঘণ্টায় শেষ হয়ে যেতে পারে, সে খেলা এভাবে মাসের পর মাস ধরে চালিয়ে যাওয়া। শুধু একটা মুভ দিয়ে থেমে যাওয়া। তারপরে আবার অপেক্ষা করা। কবে উত্তর আসবে তার প্রতীক্ষা। এটাই অবাক ব্যাপার। এর মধ্যে যে ধৈর্য আর গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় লুকিয়ে আছে সেটাই অবাক করে অনিলিখাকে। মহিলার সঙ্গে ভালো পরিচয় না থাকলেও, মহিলা যে খুব ভালো খেলেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। খুব নামকরা পরিচিত কোন প্লেয়ার হলেও অবাক হবে না অনিলিখা। অনিলিখা কালো গুটি নিয়ে খেলছে। সিসিলিয়ান ডিফেন্স। গত তিন মাস ধরে এ খেলা গড়িয়েছে।

E4 C5

NF3 D6

D4 CD4

ND4 NF6

NC3 G6

। । । ।

কচ্ছপের গতিতে এগিয়ে এখন 42 চালে। আবার কোর্টনির দানের প্রতীক্ষায়।

দাবা খেলায় দানের সময় টাইম লিমিট থাকে। এখানে সে চাপ নেই। যত ইচ্ছে সময় নাও। ঘড়ি থেমে আছে। চাইলে যে কারুর সাহায্যও নিতে পারো। শুধু চাল ফেরত নেওয়ার উপায় নেই। অনেক সময় অনিলিখা রীতিমতো পড়াশোনা করে চাল দেয়। ইংল্যান্ডে এসেও রোজ অন্তত একবার করে অনিলিখা দেখে, আগের চালের কোনও উত্তর এল কিনা।

আজ ইনবক্স দেখে মন ভালো হয়ে গেল। চাল এসেছে। কিন্তু কী সাংঘাতিক! এটা তো খেয়াল করেনি অনিলিখা। অনিলিখা যে চালই দিক না কেন আর ঠিক দুই চাল বাদে ওর রানি একটা ঘেরাটোপের মধ্যে আটকে পড়বে। বেরোতে পারবে না। এটা প্রায় চেক মেট হওয়ার সামিল। কী সাংঘাতিক প্ল্যান। যুদ্ধ হচ্ছিল

অন্য দিকে, কিন্তু সারাক্ষণ কোর্টনির আসল লক্ষ্য ছিল রানিকে এভাবে বন্দি করা। অনিলিখার রানি এখন একেবারে অকেজো।

তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ফের দাবার বোর্ডে মন দিল অনিলিখা।

১৩। ৩০ অক্টোবর

আজ রেস্টুরেন্টে অনিলিখার ল্যাপটপ পালটে গেল। অবশ্য ওরই দোষ। ওরকম একটা ভিড়ে ঠাসা রেস্টুরেন্টে ল্যাপটপের ব্যাগ স্টাফের কাছে রাখাটাই ঠিক হয়নি।

জাইকা রেস্টুরেন্ট। বেশ নামকরা। রয়াল অ্যালবার্ট হলের কাছে। ওখানে একটা অফিসের মিটিং ছিল। রাত আটটা নাগাদ বেরোনোর সময় ল্যাপটপ নিতে গিয়ে অনিলিখা খেয়াল করল, সেটা পাল্টে গেছে। ওর ব্যাগের মধ্যে যে নোটবুক, অফিসের কার্ড ছিল তা আর নেই। ব্যাগ একরকম হলেও, ব্র্যান্ড এক হলেও এই ল্যাপটপটা আনকোরা নতুন। ইচ্ছে করে একাজ কেউ করেনি নিশ্চয়ই। এরকম ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এখন উপায়? শুধু ল্যাপটপ নয়, অফিসের কার্ড, পেন, দরকারি কিছু কাগজও ছিল ওই ব্যাগে।

প্রচণ্ড টেনশনে ছিল পরের কয়েক ঘণ্টা। অফিসের অনেক দরকারি কাজের ফাইল ছিল ওই ল্যাপটপে। ল্যাপটপ বন্ধ করাও ছিল না। চালু অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল অফিস থেকে। তাই অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে কিছু দরকারি তথ্য খুঁজে বার করা শক্ত নয়। ঠিক মতো ব্যাকআপ ও নেওয়া হয়নি। হারালেও বেশ অসুবিধেয় পড়ে যাবে।

সামনেই ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স। তাতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও জার্মানির চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক ঘণ্টার একটা প্রেসেন্টেশান আছে অনিলিখার। শুধু তো ওই এক ঘণ্টার বক্তব্য রাখা নয়, তার পিছনে অনেক ডেটা পয়েন্ট, অনেক রিসার্চ থাকে। যার সঙ্গে পালটে গেছে, সেও নিশ্চয়ই টের পাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাগ খুললেই। সাড়ে ন'টা অব্দি রেস্টুরেন্টেই অপেক্ষা করল অনিলিখা। খবর এল না। অগত্যা ওর যোগাযোগের নাম্বার রেস্টুরেন্টে রেখে হোটেলের দিকে রওনা হল।

যথেষ্ট টেনশন হচ্ছে। অনেক ব্যক্তিগত তথ্য তো থাকেই ল্যাপটপে। এগুলো কারুর হাতে গেলে সে কীভাবে ব্যবহার করবে সেটাই চিন্তার কথা। অনেক দরকারি ফাইল পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রোটেক্টেড থাকলেও আজকাল কে যে কীভাবে সেই পাসওয়ার্ড বের করে নেবে বলা মুশকিল।

হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছে, ঠিক এমনসময় আবার ফোন এল। যে ব্যক্তির সঙ্গে ল্যাপটপের ব্যাগ পালটে গিয়েছিল, তিনি এসে ব্যাগ ফেরত দিয়ে ওনার ব্যাগ নিয়ে গেছেন। একইসঙ্গে এরকম অসুবিধেয় ফেলার জন্য অনিলিখার উদ্দেশ্যে দুঃখ প্রকাশও করে গেছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিলিখা ফিরে চলল রেস্টুরেন্টে ব্যাগ সংগ্রহ করতে। যাক, শেষ পর্যন্ত ব্যাগ ফেরত পেয়েছে অনিলিখা। ব্যাগের ভিতরের সবকিছুও ঠিকঠাক আছে। এমনকী ব্যাগের ভিতরে মহার্ঘ মঁল্লা পেনটা পর্যন্ত যথাস্থানে আছে। অর্থাৎ যিনি ব্যাগটি পেয়েছিলেন তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।

অফিস থেকে কাছের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন যাওয়ার পথে রোজ একজন ভিখিরি বসে থাকে। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে রোজ সে চেলো বাজায়। ভারী সুন্দর মন উদাস করা সুর। লোকটার মোটা নাক। চোখের নীচটা বেশ খানিকটা বসা। নাক আর ঠোঁটের মাঝের অংশে একটা

গভীর কাটা দাগ। একদিকের গাল কীরকম আগুনে পোড়া কালো। মুখে চোখে হিংস্রতা। মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে এসেছে।

অনিলিখা বিশ্বাস করে, কাউকে আগে থেকে ভালো বা খারাপ ভাবা উচিত নয়। মূল সমস্যা হল আমরা আগে থেকে কারুর সম্বন্ধে ধারণা করে বসি। সাদা কালো রং লাগাই। তারপরে যেটা ভাবি, সেটাই তার সঙ্গে পরিচয়ে আগে থেকে আরোপিত করি। অনিলিখা এর বাইরে।

কিন্তু এই লোকটার মুখের মধ্যে কী যেন আছে যা অনিলিখাকে স্বস্তি দেয় না। মাঝে মধ্যে লোকটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয় ওই লোকটার দৃষ্টি ওর উপরেই নিবদ্ধ। যেন এই হাজার লোকের ভিড়ে লোকটা অনিলিখার জন্যই ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত আটটা। আশেপাশের রাস্তা শুনশান। শুধু ল্যাম্পের হলুদ আলো যেন ভিজে রাস্তায় জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে। অফিস থেকে ফেরার সময় অনিলিখা যখন লোকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মনে হল লোকটা ঠান্ডায় কাঁপছে। আজ ওর চেলোটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ। পাশেই বাস স্ট্যান্ড। এ সময় হঠাৎ জোর বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল অনিলিখা।

সেখান থেকেই লোকটাকে লক্ষ্য করতে থাকল। চোখ বন্ধ করে বসে আছে। মাঝেমধ্যে ঠান্ডায় কেঁপে উঠছে। দূর থেকে দেখলে অনেক সময় ভুল ধারণা হয়। একজনকে যখন কাছ থেকে দেখা যায়, যখন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার চারপাশের পৃথিবীটা দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন তার আসল চরিত্রটা ধরা পরে। ওর মনে হল লোকটা পরম স্নেহে একটা ছবি আঁকড়ে ধরে আছে।

অনিলিখা বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওর ছাতাটা লোকটাকে দিয়েছিল। আর তখন দেখেছিল, লোকটার সামনের ফ্রেমবন্দী ছবিতে ওই লোকটার সঙ্গে একটা কমবয়েসি ছেলে ও এক মহিলা আছে। অনিলিখা জিগ্যেস করেছিল, কে ওরা। উত্তরে জানতে পেরেছিল, ওর ছেলে আর বউ। কিন্তু ওরা আর নেই। আগে ও যেখানে থাকত, সেই বহুতল কাউন্সিল হাউসে আগুন লাগায় তারা মারা গেছে। বিধ্বংসী আগুন এমনভাবে লেগেছিল যে মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওরা এসেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে লন্ডনে আশ্রয়ের খোঁজে। এখনও খুঁজে চলেছে ওর স্ত্রী-পুত্রকে। হয়তো তারা এখনও বেঁচে আছে এই আশায় নির্ভর করেই ওর বাকি জীবন কেটে যাবে।

লোকটা কথা বেশি বলে না। শুধু বলেছিল যে সে নাকি দেখেছে, মাঝেমধ্যে অনিলিখাকে একটা বিশাল লম্বা দাড়িওয়ালা লোক উল্টো দিকের রাস্তা থেকে লক্ষ্য করে। সেটা ও আগে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি।

অনিলিখা চুপ করে থাকে। কিন্তু এবারে ওরও লন্ডনে থাকা কালীন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। মাঝেমধ্যে ওর অফিস থেকে দেওয়া ফোনটায় আলো জ্বলে ওঠে। একটা ঘসঘস আওয়াজ হয়। এবারে ডেটা ইউসেজও অনেক বেশি হয়েছে। কোনওভাবে ওর ফোনে কোনও স্পাই সফটওয়ার নেই তো?

১৪। ২১ নভেম্বর

ছবিগুলো যেন একটু-একটু করে জুড়ছিল। আস্তে-আস্তে অনিলিখার চোখের সামনে ফিরে আসছিল আবছা-আবছা কয়েকটা চেহারা। গেস্টহাউস থেকে যার সঙ্গে এ-বাড়িতে প্রথম এসেছিল সেই মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা খুব গম্ভীর। চোখদুটো হিংস্রতায় জ্বলছে।

কিছু দূরে সারা। একটা চেয়ারে বসে। মুখে নিষ্ঠুর হাসি। চোখ দুটো যেন দরজায় লাগা বুলেটের গর্তের মতো কঠিন। আস্তে আস্তে উঠে বসল অনিলিখা। মাথাটা এখনও ঘুরছে।

অনিলিখা খেয়াল করল, এ ঘরে আগে আসেনি। ঘরে আলো খুব কম। পাশে জানলা থাকলেও পর্দা টানা। তার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসেছে। এটা গেস্টহাউস নয়। এটা এই পুরোনো মূল বাড়িরই একটা অংশ। ওর হাত দুটো কব্জির কাছে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা। মুখ বাঁধা।

কাজের মহিলাটি অনিলিখাকে টেনে তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। অনিলিখা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। এই মহিলার গায়ে যে অসুরের শক্তি তা ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে। তা ছাড়া ওর হাত বাঁধা। ঘরে আরও অন্য লোক আছে।

মহিলা আস্তে-আস্তে ওকে পাশের ঘরের দরজার দিকে নিয়ে গেল। সারাও পিছু-পিছু আসছেন। বিশাল একটা কাঠের দরজা পেরিয়ে এবারে যে ঘরটার মধ্যে ওরা ঢুকল, সেটা বিশাল। এ ঘরটাও একইরকম অন্ধকার। কোনও আলো নেই। শুধু পর্দা টানা। জানলার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে সেটুকুই শুধু ঘরে আলোছায়ার চাদর পেতেছে। দূরে একটা হেলানো চেয়ারে একটা মেয়ে বসে আছে। ওর আরও কাছে নিয়ে যাওয়া হল অনিলিখাকে।

কাছ থেকে দেখতে পেল অনিলিখা। এই কি সারার মেয়ে? এককথায় অপরূপা সুন্দরী। কিন্তু গায়ের রঙ মৃত মানুষের মতো। খয়েরি চোখ। বয়স অনিলিখার মতোই। ওরই মতো কালো চুল। নাক-চোখ-মুখে ওর সঙ্গে বড় রকম মিল আছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে, পুরোপুরি উন্মাদের ছাপ। দু-হাতেরই কনুই থেকে নীচের অংশ পুরো ব্যান্ডেজে মোড়া। ঠোঁটের কোণে অনিলিখার উদ্দেশ্যে বিকৃত হাসি।

অনিলিখাকে আরেকটু কাছে নিয়ে যেতে হঠাৎ মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আরও কাছে এসে অনিলিখার মুখের থেকে ঠিক দু-ইঞ্চি দূরে মুখটা রেখে খুব কৌতূহলের সঙ্গে ওকে দেখতে লাগল। তারপর আবার অদ্ভুতভাবে খিকখিক করে হেসে অনিলিখাকে চারদিক দিয়ে ঘুরে-ঘুরে ভালো করে দেখল।

ওই কাজের মহিলা এবারে শক্ত করে অনিলিখার হাতটা ধরে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা অদ্ভুত ভাবে অনিলিখার আঙুলগুলো নিয়ে দেখতে থাকল। একটা একটা করে। তারপরে ফের অনিলিখার মুখের খুব কাছে মুখ এনে খসখসে গলায় বলে উঠল,—খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। ঠিক এরকমই চাই।

তারপরে খানিক দূরে গিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠল। অনিলিখাও চমকে উঠল।

—মা! আমার ঠিক এরকমই চাই। এরকম আঙুল। —তারপরে বীভৎসভাবে হাসতে শুরু করল। সারা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ওর মেয়ের কাছে।

বললেন,—তাই হবে সোনা। তাই হবে। সেজন্যই তো ওকে নিয়ে এসেছি।

অনিলিখার কাছে এসে সারা আবার বলে উঠলেন,—বলেছিলাম না, তোমার আঙুলগুলো খুব সুন্দর। সত্যি তাই। জানতাম ওর খুব পছন্দ হবে। এটা ওর এক আজব খেয়াল। যার যেটা পছন্দ সেটাই ওর লাগবে আর আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর কাজের মহিলাকে বলে উঠলেন,—যাও, অনিলিখাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও।

অনিলিখা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কথা শেষের আগেই অনিলিখা হঠাৎ করে মহিলার হাত ছাড়িয়ে হাত তুলে কনুই দিয়ে পাশের মহিলার মাথার পাশের দিকে আঘাত করল। মহিলা ছিটকে দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু আর কিছু করার আগেই অনিলিখা টের পেল সারা মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক বের করেছেন। আর সে বন্দুক অনিলিখার উপরেই তাক করা।

একইসঙ্গে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী লোক ছুটে এসে অনিলিখাকে পিছন থেকে জাপটে ধরেছে। অনিলিখা লাফিয়ে উঠে বাঁ-পা দিয়ে পিছন দিকে একটা জোরালো লাথি মারল। অন্য যে কেউ হলে পড়ে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে ওর মনে হল যেন একটা লোহার স্তম্ভে লাথি মেরেছে। লোকটা আরও জোরে ওকে পিছন থেকে জাপটে ধরল।

বাধ্য হয়ে অনিলিখা খানিকক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা করে থেমে গেল। লোকটার গায়ে অসুরের জোর!

সারা ফের হেসে উঠলেন,—এখান থেকে পালানোর কোনওই উপায় নেই। জেমস কিক বক্সিং-এ ন্যাশনাল চাম্পিয়ন ছিল। এখন আমার এখানে। এরকম আরও অনেকে আছে। কাজ করে...জেমস! মেয়েটাকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অনিলিখাকে লোকটা ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এর মধ্যে অনিলিখা ফের শুনল সারার মেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে—আমার আঙুলগুলো একদম ভালো না। একদম বাজে। আমার ওর আঙুলগুলোই চাই! এখনই চাই!

এ-বাড়ির মধ্যে যে এরকম একটা গোপন সুড়ঙ্গ আছে তা ভাবাই যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে বিলিয়ার্ডস রুমে নিয়ে আসা হল ওকে। ঘরের কোণে একটা বড় গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। ওটা সরিয়ে ফেলা হল। তার পরে ক্লকটা যেখানে ছিল সেখানকার মাটির উপরে জোরে পা দিয়ে ধাক্কা মারতে সামনের দেওয়ালে একটা লুকোনো দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

দরজাটা এমনভাবে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল, এমনিতে খেয়াল করা যেত না। দরজার মধ্যে দিয়ে অনিলিখাকে নিয়ে অনিলিখার পিছন পিছন জেমস এগোল। অনিলিখার আগে আরও দুজন লোক। মিনিট পাঁচেক বাদে ওকে যে ঘরে নিয়ে আসা হল সেটা একটা আধুনিক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারকেও হার মানায়।

অনিলিখাকে জোর করে একটা খাটে শুইয়ে ফের হাত আর পা বেডের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

এর মধ্যেই চেনা একটা গলা পেল অনিলিখা। সুভদ্রর।

—কী, লাস্ট চালটা মনে আছে অনিলিখা? বুঝতে পারোনি তো যে আমি শুধু তোমার বোড়ে, হাতি আর ঘোড়া খাওয়ার জন্য বসে ছিলাম না। আসল লক্ষ্য ছিল ওদের উপরে আক্রমণের আড়ালে তোমার রানিকে ঘিরে ধরা। এমনভাবে ঘিরে ধরা যাতে তা সহজে আর আমার সাজানো ফাঁদ থেকে বেরোতে না পারে। রানিকে ফাঁদে ফেললে রাজা আর কতদূর! আর কয়েক দানেই চেক মেট হতে।

হ্যাঁ, এবার আমাদের কাজের কথায় আসি। এখানে অবশ্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার জন্য আলাদা রানি খুঁজে বের করি। যেমন চার দিন বাদে কেলটিক ম্যানরে যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার রানি তুমি। এবারে খুন হবে তিন দেশের প্রধান নেতা। সবার মনে হবে এই ঘটনায় তুমিই হলে মূল অভিযুক্ত। তোমার স্পেশাল অ্যাক্সেস কার্ড, তোমার আইডি ব্যবহার করে ঠিক তোমার মতোই একজন যখন এ ঘটনা ঘটাবে, তখন কেউ জানবেও না যে তোমার কোনওই দোষ ছিল না। তুমি কোনওভাবে যুক্ত ছিলে না এর সঙ্গে। তোমার সঙ্গে চিরকালের জন্য একটা নতুন টাইটেল যুক্ত হয়ে যাবে—মোস্ট ওয়ান্টেড ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট। হয় আমরা তোমাকে মারব, না হলে ওরা।

—কিন্তু আমাকে বাছলে কেন?

—গুড কোয়েশচেন। আমরা প্রত্যেকবার সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটানোর মাস খানেক আগে থেকে প্ল্যান শুরু করি। এমন একজনকে খুঁজে বের করি যার প্রোফাইল এমন হয় যে তাকে আগে থেকে কোনওভাবে সন্দেহ করার উপায় থাকে না। তোমাকে যেমন সন্দেহ করার কারণ নেই। অন্য কেউ হলে তার উপরে আগে থেকেই পুলিশের নজরদারি অনেক বেশি হত। আর দুই, তোমাকে এখানে কেউ ভালো করে চেনে না। তাই তোমার আই ডি দিয়ে অন্য কেউ যদি ঢোকে, তাহলে তাকে দেখে সবাই অনিলিখাই ভাববে। তবে এক্ষেত্রেও আমরা এমন একজনকে বেছে নিয়েছি, যাকে কিনা দেখতে অনেকটা তোমারই মতো। বুঝতেই পারছ কার কথা বলছি। অবশ্যই আমরা বিভিন্ন সন্ত্রাসের ঘটনার জন্য এ ধরনের কাউকে যখন বেছে নিই, তখন তার পিছনে এই কারণগুলো ছাড়াও আরও অন্য অনেক কারণ থাকে। এক্ষেত্রে যেমন তুমি যেসব রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে দেখা করবে, অন্যরা সে সুযোগ খুব কমই পাবে। তবে কোথায় কবে আমরা এরকম ঘটনা ঘটাব, পুরো প্রসেসটার প্ল্যানিং-এর সাতটা ধাপ আছে।

—কীরকম?

—প্রথম, প্ল্যান করা হয় কোথায় কবে কীভাবে ঘটনাটা ঘটানো হবে। সেটা আদৌ সম্ভব কিনা, কীভাবে কতটা ক্ষতি সম্ভব সেটা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাকে ওরা তারপরই জানায় কীরকম প্রোফাইলের লোক লাগবে। যেমন, হয়তো জানাল এমন একজনকে দরকার যে লন্ডনে বাস চালায়।

দুই, এবার আমার কাজ শুরু হয়। আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। প্রচুর লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। আমি নিজে MI5-এ কাজ করি। ওদের চাহিদার উপর নির্ভর করে আমি বের করি কার পক্ষে এটা করা সবথেকে সহজে সম্ভব।

তিন, এবার সময় আসে তাকে ঘিরে দাবার ঘুটি সাজানোর। আমি, সারা, আমরা সবাই মিলে সেই বেচারির আইডেন্টিটি ফ্রড করি। অর্থাৎ সেই লোকটার সব ব্যক্তিগত তথ্য বার করে নিই। সবকিছু।

চার, এবার সেই লোকটার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের উপরে নির্ভর করে ঠিক করা হয় কে এই কাজ সারবে। এই আসল অপরাধী কে তা আমিও অনেক সময় জানতে পারি না। এটা ওরাই ঠিক করে। আমার কাজ শুধু তার কাছে সব তথ্য তুলে দেওয়া। এবার সেই আসল ক্রিমিনাল অন্যজনের পরিচয় নিয়ে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটায়।

পাঁচ, নিশ্চিত করা হয় যে সেই আসল অপরাধী পালিয়ে যেতে পারে।

ছয়, পুলিশের সামনে তুলে ধরা হয় আমাদের সাজানো গুটি সেই নিরপরাধ মানুষটাকে যার পরিচয় নিয়ে এ কাণ্ড ঘটেছে। সন্দেহের কারণ ওরাও পায় না। কারণ সব ফরেন্সিক এভিডেন্স তার বিরুদ্ধেই থাকে। পুলিশকে, এখানকার ইন্টেলিজেন্সকে বিভ্রান্ত করি যাতে তারা সবাই নকল খুনির পিছনে ছোটে।

সাত, আমরা নিশ্চিত করি যাতে এই নিরপরাধ লোকটা, এই সাজানো গুটি বোর্ডের বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ কাউকে কিছু বলার আগেই মারা যায়। সে আমাদের হাতেই হোক কি পুলিশের হাতে হোক।

—বুঝলাম। এক্ষেত্রে সেই সাজানো গুটি হলাম আমি। আর তাই আমার ফোন ট্যাপ করে আগে থেকে আমি কোথায়, কবে যাচ্ছি সব খোঁজখবর নিতে, তাই তো?

—একদম। আমরা সবই জানতাম। কোনওটাই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। এখানে যেমন শুধু সারার মেয়ে কেরীর ইচ্ছেতেই তোমার আঙুলগুলো কেটে নেওয়া হবে না। আমরা জানি কিছু জায়গায় কিছু মিটিং-এ যাওয়ার জন্য ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানের ব্যবস্থা করেছে। তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। যাতে অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকতে না পারে। এক্ষেত্রে তাই যেই এ কাজটা করতে যাক না কেন, তার তোমার দেওয়া আঙুলের ছাপের দরকার পড়বে। আর তাই চার দিন বাদে এ ঘটনাটা যখন ঘটবে, তখন তাতে তোমার জায়গা নেবে আর কেউ না, কেরী নিজেই। স্পেশাল কাজের জন্য স্পেশাল পারসন। তবে ওকে ওখান থেকে ঘটনার পরে দ্রুত বের করে নেওয়ার জন্য আমাদের লোক থাকবে। কেরীর মাথা যখন ঠিক থাকে, তখন ওর মতো বুদ্ধি খুব কম মহিলাই রাখে। এটা ও ওর মা সারা, দিদা বেকির কাছ থেকে পেয়েছে।—থামল সুভদ্র ওরফে শোভি।

ফের বলে উঠল,—কী আর কোনও প্রশ্ন? শেষ ইচ্ছে?

—কিন্তু আমাকে মেরে ফেলে কী লাভ?

—না, সত্যি এভাবে মেরে ফেলার তেমন কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু শত্রুকে জীবিত রাখতে নেই। কবে তুমি আবার কীভাবে প্রমাণ করে দেবে যে তুমি এসবের পিছনে ছিলে না। তবে তোমাকে তো ঘটনার দিন অব্দি বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তা না হলে কী করে প্রমাণ হবে যে তুমিই এর পাণ্ডা।

আর দেখো, আমি কিন্তু এতে সরাসরি যুক্ত নেই। আমার শুধু টাকার দরকার। ঠিক যেমন সারার। আমরা এভাবে এক-একজনের আইডেন্টিটি ফ্রড করে শুধু কোটি-কোটি ডলার রোজগার করি। সেটাই আসল উদ্দেশ্য। এর পিছনে আসলে কারা আছে তা তুমি আন্দাজ করতেই পারছ! তাদের হাত অনেক অনেক দূর অব্দি যায়। আমরা শুধু দাবার বোড়ে, ঘোড়া, গজ। তাদের চিনিও না।

—তোমরা যাদের উপরে দোষ চাপিয়েছ, যাদেরকে অপরাধী সাজিয়েছ, তাদের সবাইকেই কি মেরে ফেলেছ?

—অবশ্যই। তাদের সবাইকে হয় আমরা মেরেছি, না হলে তাদের যাতে পুলিশ বা MI5 মারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পুলিশের মুখের কাছে তুলে দিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছি যাতে ওরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। যেমন ধরো, স্টেশন সুপারভাইজার হ্যানাকে ওরা মেরেছিল। কাউকে কাউকে এখানে এনে মেরে ফেলা হয়েছে। এবার জনের কথায় আসি। বেচারী ভালোমানুষ জন কিছুই জানত না। ওর সম্বন্ধে তো এখনও অনেক কাগজে ফলাও করে খবর বেরোয়। সবাই পুলিশকে এখনও দোষারোপ করে ওর মতো একজন টেররিস্টকে ধরতে পারেনি বলে। কিন্তু যে নেই, তাকে আর ধরবে কী করে। ভাবো তো! পুলিশের বিরাট টিম আজও দিনরাত এক করে জনকে খুঁজে যাচ্ছে, আর আসল অপরাধী তার আড়ালে যা ইচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে। ওকে কয়েকমাস আগে এখানেই ডেকে এনে মেরে ফেলা হয়েছে। ও বাঁচার জন্য এখানে পালিয়ে এসেছিল।

বানের টানে ভেসে যাওয়ার আগে কেউ হাতের কাছে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তাই ওদেরকে লোভ দেখিয়ে এখানে ডেকে আনাটা সহজ কাজ ছিল। এদের পালানোর অন্য কোনও জায়গা ছিল না। এদের সবাইকে এখানকার ডেথচেম্বারগুলোতে গ্যাস প্রয়োগে মারা হয়েছে। তারপরে শরীর এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনওদিন ওদের মৃতদেহ পাওয়া না যায়।

এতক্ষণ সারা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন। এবারে এগিয়ে এলেন।

বলে উঠলেন,—নাহ! আর সময় নেই শোভি। টিম অপারেশন থিয়েটারে অপেক্ষা করছে। কেরীও খুব এক্সাইটেড। ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা লিসার থেকে নিয়েছিল। সেবারে কীরকম খুশি হয়েছিল দেখেছিলে তো! ও এবারে তার থেকেও অনেক বেশি এক্সাইটেড।

দুজন নার্স ইতিমধ্যে ঘরে এসে গেছে। অনিলিখার চাকা লাগানো বেডটা ওরা ঠেলে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। তারপরে ওকে বেড থেকে তুলে শোয়ানো হল অপারেটিং টেবিলে। মাথার উপরে বিশাল সার্জিকাল লাইট। তিনজন ডাক্তার। তাদের প্রত্যেকের গায়ে নীল গাউন। মুখ ঢাকা, ক্যাপ পরা। শুধু চোখ দেখা যাচ্ছে। মাথার কাছে অ্যানাস্থেশিয়ার মেশিন। অনিলিখার মুখে অক্সিজেনের টিউব লাগিয়ে দেওয়া হল। অপারেশন এখনই শুরু হবে। অনিলিখা আড়চোখে দেখল শুধু শোভি, জেমস আর সারা নয়। আরও দুজন টানটান চেহারার শক্তিশালী লোক ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক এই সময় একজন ডাক্তার হঠাৎ ডাক্তারি মাস্ক খুলে ফেলল। আর কেউ না, স্বয়ং স্টিফেন! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক বের করে বলে উঠল,—কেউ কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে না। পুরো এলাকা পুলিশ আর MI5-এর মিলিটারি কম্যান্ডোরা ঘিরে ফেলেছে। পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি চালাতে বাধ্য হব।

বাকি দুজন ডাক্তারও মুখোশ খুলে ফেলেছে। তাদের হাতেও বন্দুক।

সারা ওর রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটা গুলি এসে ওর হাতে লাগল। চিৎকার করে হাত চেপে মাটিতে বসে পড়ল সারা। শোভি আর জেমস হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক তেমনই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আরও দুজন। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে গুলি চালাতে গেল। সময় পেল না। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন পুলিশ ঢুকে এসেছে। বলতে গেলে বিনা বাধায় তারা সারা ও অন্যান্যদের অ্যারেস্ট করল। যেটুকু বাধা এসেছিল, তা কেরীর থেকেই। পুলিশের হাত কামড়ে মেয়েটা পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু সুবিধে হয়নি। পিছমোড়া করে নিয়ে যাওয়ার সময় তখনও চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছিল, ওর নাকি অনিলিখার আঙুলই চাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিলিখার হাতে পায়ে লাগানো লোহার বেড়ি খুলে ফেলল পুলিশ।

অনিলিখা উঠে বসল। বলে উঠল,—সুভদ্র! এবার আমার কথা শোনাই। শুধু রানিকে ফাঁদে ফেললেই খেলা শেষ হয় না। তার পরেও হারার সম্ভাবনা থাকে।

আমার যখন প্রথম ল্যাপটপ চুরি হয়, তখনই আমি পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলাম। জানতাম, এটা স্বাভাবিক নয়। আমাকে ঘিরে অন্য কোনও চক্রান্ত হচ্ছে। এমনকী আমার ফোন যে ট্যাপ করা হয়েছে, তাও বুঝতে পেরেছিলাম। পুলিশকে জানিয়েছিলাম যাতে ওরাও আমার ফোন ট্যাপ করে। এমনকী কোর্টনি নামের ফেসবুকের ফেক প্রোফাইল থেকে দাবার চাল, সেটাও আমার কাছে সেই জন্যই এতই ইন্টারেসটিং লেগেছিল। অপরাধী নিজে কতটা বোকা হলে আর কতটা দুঃসাহস থাকলে, নিজেকে এভাবে আমার হাতে তুলে দেয়! হয়তো বারবার অপরাধ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলে বলেই তোমার দুঃসাহস এতটা বেড়েছিল। আমিও শুধু-শুধু চাল দিইনি। তার আড়ালে উদ্দেশ্য ছিল কোথা থেকে আসছে সেই আই পি আড্রেস ট্র্যাক করা। কোথা থেকে এ কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে তা আন্দাজ করা।

স্টিফেন এগিয়ে এল। অনিলিখার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল,—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি রাজি না হলে তোমাকে সামনে রেখে এত কিছুর সন্ধান পেতাম না। কাজটা তোমার পক্ষে কতটা রিস্কি আর শক্ত ছিল, আমরা তা জানি। তবে এখনও তো অনেক বাকি। কী বল অনিরিকা?

স্টিফেন অনিলিখার নামটা এখনও ঠিকভাবে বলতে শেখেনি।

১৫

কেলটিক ম্যানর রিসর্ট হোটেল। সন্ধে ছ'টা। প্রেসেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে অনিলিখার। অনেকেই মুগ্ধতা জানিয়ে গেছে অনিলিখার বক্তব্যের পরে। খানিক আগে জার্মানির চ্যান্সেলার ও কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে আলাদা আলোচনাও হয়েছে অনিলিখার। কীভাবে গ্লোবাল ওয়ারমিং বা উষ্ণায়নের জন্য বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে ও তার জন্য জার্মানির অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে আলোচনা ছিল। জার্মানির চ্যান্সেলার অত্যন্ত অবাক হয়েছেন অনিলিখার এই তথ্যবহুল রিসার্চের কথা জেনে। এরকম হতে থাকলে বন্যা, হিট ওয়েভ, ঝড় বাড়বে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমবে। জার্মানি ও ইউরোপের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে পারে। এ বিষয়ে সব শুনে উনি আরও আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন এ বিষয়ে রিসার্চে উপযুক্ত ফান্ডিং-এর ব্যবস্থা করবেন। অনিলিখাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য।

খানিক পরেই ডিনার মিটিং হবে। উপস্থিত থাকবে বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ নেতা, সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিক, দেশ বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণিজন। বিশাল বলরুমে এক-এক করে সবাই জড়ো হচ্ছে। বাইরে কড়া নিরাপত্তা।

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় একটা ছোট আনাউন্সমেন্টের পরে ডিনার পার্টি চালু হয়ে গেল। অনিলিখা আজ পরেছে কালো সিল্কের শাড়ি। অনেকের দৃষ্টিই যে ওর দিকে তা ও বুঝতে পারছে। খুব কম ভারতীয় মহিলাই আছেন এখানে। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে।

কিন্তু সে লোকটা কোথায়? কীভাবে তাকে চিনবে অনিলিখা? আর তাকে না পেলে তো দাবার আসল রাজারই খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কিছু দূরে স্টিফেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য এক মহিলার সঙ্গে গল্প করছে। একটু খেয়াল করতে অনিলিখা বুঝল, ইনি হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রাউলিং। হ্যারি পটার তেমন ভালো না লাগলেও রাউলিং-এর সঙ্গে আলাপের এ-সুযোগ ছাড়া যাবে না। আজ স্টিফেনের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। স্টিফেন ও ঘরে ছড়িয়ে থাকা গোয়েন্দারা যে প্রত্যেক আগন্তুক ও অতিথির উপরে নজর রেখেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে সাতটায়। বিশাল হলঘরের এককোণে তিনজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। এবার শুরু করল ভিভাল্ডির 'ফোর সিজনস'।

এখনও কোনও সন্দেহজনক লোকের খবর নেই। তাহলে কি সব সাবধানতা সত্ত্বেও ওদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে? ওরা কি জেনে গেছে যে ওদের প্ল্যান ভেস্তে গেছে? নাকি ওরা এখনও জানে যে, অনিলিখার জায়গায় অন্য কেউ আসবে?

ঠিক এইসময়ে একজন ছ'ফুট লম্বা বিশাল চেহারার টাকমাথা ভদ্রলোক অনিলিখার দিকে এগিয়ে এল। খুব কাছে এসে হ্যানডশেক করে বলে উঠল,—আমি শেখ জাবের আল আহমেদ। আপনাকে আমি কী নামে ডাকব?

অনিলিখা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—অনিলিখাও বলতে পারেন।

লোকটা মুচকি হেসে বলে উঠল—আমরা রেডি।

ওরা এখনও জানে না যে, অনিলিখা আছে অনিলিখাতেই। তাতে কোনও রহস্য নেই।

দাবার বোর্ডে রাজা এতদিনে সত্যি কোণঠাসা হতে চলেছে।



রহস্য যখন সংকেতে



১

আবার পাওয়া গেল শুধু কঙ্কাল।

আমাদের শনিবারের আসরে আজকের মধ্যমণি বিশ্বজিৎদা নয়, এমনকী অনিলিখা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, অনিলিখাও নয়। আজকের মূল আকর্ষণ বহুপ্রচলিত বাংলা দৈনিকের প্রথম পাতার এই খবরটা। বহুক্ষণ ধরে হাত বদল হয়ে, এক হাত থেকে আরেক হাতে গিয়ে শেষে এখন তার অবস্থান আমাদের মাঝের টেবিলে। এখনও যেন কত কী বলতে চায়, আর তাই বারবার আমাদের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ছে খবরের বিষয়টা। সকাল থেকে যে-ক'বার টিভি চালিয়েছি, বারবার সেই একই খবর। নেহাত আমাদের এই বসার ঘরে টিভি নেই। আমাদের আজকের আড্ডায় ঘুরে ফিরে আসছে সেই একই খবর। সেই একই আলোচনা—কঙ্কাল কাণ্ড।

এই নিয়ে গত দু-সপ্তাহে তৃতীয় বার। ঠিক দুদিন পরপর খুন।

প্রথম খুন ব্যারাকপুরে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রফেসার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। নামকরা প্রফেসার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অনেক রাত করে কলেজ থেকে ফিরেছেন। একসঙ্গে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে খেয়েছেন। খাতা দেখবেন বলে পাশের ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সারা রাত শুতে যাননি।

সকাল হতে পড়ার ঘরে ঢুকে ওনার স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে যান। ওনার চিৎকার শুনে বাড়ির কাজের লোক ছুটে আসে। উনি ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছেন। পড়ার ঘরে ওঁর থেকে একটু দূরে মেঝের উপরে উপুড় হয়ে গোবিন্দবাবু পড়ে আছেন। বা বলা যায় গোবিন্দবাবুর পোশাকে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে।

তখনও ওটাই যে প্রফেসার গোবিন্দবাবুর সেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরে ডিএনএ টেস্ট থেকে জানা যায় যে ওটা গোবিন্দবাবুর কঙ্কাল। কিন্তু যে লোক কয়েক ঘণ্টা আগেও হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ করে কী হতে পারে যে সে রাতারাতি কঙ্কালে পরিণত হল। মৃত্যুর কোনও কারণ এখনও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় খুন ইন্দ্রনীল মুখার্জি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বাড়ি সল্টলেক। একটা নামি আইটি সংস্থায় কাজ করতেন। বছর ছয়েক চাকরি করেছেন। অবিবাহিত। ছোট পরিবার। বাবা, মা, ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন।

এখানেও খুন রাতের বেলায়। বাড়ির কাজের লোক মুন্না সকালে রোজকার মতো ডাকতে এসে অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকে। দেখে ইন্দ্রনীলবাবু রাতে যে পোশাক পরে শুয়েছিলেন, ঠিক সেই পোশাকেই খাটে শুয়ে আছেন। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ পড়ে ওটা ইন্দ্রনীলবাবু নন, ওনার পোশাকে একটা কঙ্কাল। ঠিক যেন একটা কঙ্কাল ইন্দ্রনীলবাবুর পোশাকের মধ্যে ঢুকে শুয়ে আছে।

এই দৃশ্য দেখে মুন্না ভয় পেয়ে ভোজপুরী ভাষায় যে চিৎকার শুরু করেছিল, এক ঘণ্টার আগে তা থামেনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। পরে একই ভাবে প্রমাণিত হয় যে ওটা ইন্দ্রনীলবাবুরই কঙ্কাল।

তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে যে সন্ধে ন'টা নাগাদ কোনও এক কুরিয়ার এসেছিল। ইন্দ্রনীলবাবুর জন্য কোনও একটা গিফট প্যাক নিয়ে। এত রাতে সাধারণত কোনও কুরিয়ার আসে না। পাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান ইন্দ্রনীলবাবু। আর তার খানিক বাদে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে শোয়ার ঘরে চলে যান। গিফট প্যাকে কী ছিল, কোত্থেকে এসেছিল সে বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ।

তৃতীয় খুন গতকাল। এবার খুন হলেন মহিলা। পরিচিত অভিনেত্রী লিলি বসু। বয়স পঞ্চাশের কাছেপিঠে। বাড়ি লেক গার্ডেনস। ইদানীং সিনেমা খুব একটা করছিলেন না। টিভিতে একটা জনপ্রিয় সিরিয়ালে অভিনয় করছিলেন।

কালকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। ওনার স্বামী বাইরে থাকেন। গত পরশু সন্ধের দিকে কেউ ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে সামান্য কিছুক্ষণ সময় ছিল। চলে যাওয়ার পরে রাত দশটা নাগাদ সামান্য

খাবার খান। অন্যদিন এর পরে বেশ খানিকক্ষণ টিভির সিরিয়াল দেখেন। ওইদিন শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি শুতে চলে যান।

সকালে সাড়া না পেয়ে বাড়ির কাজের মেয়ে মীনা ডাকতে গিয়ে দেখে, ঘরের মেঝেতে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। গত কয়েকদিনের দুটো ঘটনার পরে কারুর বুঝতে দেরি হয়নি যে ঠিক কী হয়েছে। এটা যে ওনারই কঙ্কাল তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন আসেনি। তবে এখনও ডিএনএ শনাক্তকরণ হয়নি।

বুঝলে অনিদি, এখানেও একটা শার্লক হোমসের দরকার ছিল। যা হচ্ছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।—সহেলি বলে উঠল।—কী করে খুনি বারবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে খুন করে যাচ্ছে বলো তো। কেউ টেরও পাচ্ছে না। আর খুন বলে খুন, এটা কী ধরনের মার্ডার যে শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকছে। এরকম কি আদৌ সম্ভব?

অনিলিখা আজকে খুবই অন্যমনস্ক। কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে অনেক বই কিনে সেখান থেকে সোজা আমাদের শনিবারের আসরে। এতক্ষণ ওই খবরটা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, প্রায় ইচ্ছে করেই যেন কোনও কথা বলেনি। অথচ বেশ বুঝতে পারছি হাতে 'দ্য ফর্মুলা' বলে লিউক ডরমেল-এর একটা বই থাকলেও বইয়ের পাতা ওলটানোর মাঝে আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে। আর অন্য কিছু একটা কথা ভাবছে।

সহেলির কথায় এতক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে উঠল—শার্লক হোমসের কথা বললি বলে বলছি। জানিস তো, শার্লক হোমসের লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের কি হয়েছিল।

বেশ বুঝতে পারলাম, অনিলিখা ওই খুনের ব্যাপারে কোনওরকম আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে। আলোচনার মোড় অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা।

তবু অনিলিখা কথা বললে না শুনে থাকা যায় না।

অনিলিখা বলতে থাকে—আর্থার কোনান ডয়েল 1921 সালে ফ্রান্সের লিয়নে ডক্টর এডমন্ড লোকার্ডের ল্যাবরেটরিতে যান। ডক্টর লোকার্ড কে জানিস তো? উনি হলেন আধুনিক ফরেনসিকসের জনক। ওনাকে ফ্রান্সের শার্লক হোমস বলা হত।

তা উনি শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলকে দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে 'ব্ল্যাক মিউজিয়াম' দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে লোকার্ডের ফরেনসিকসের টেকনিকের উপর নির্ভর করে যেসব অপরাধীকে ততদিনে ধরা হয়েছিল, তাদের সবার অপরাধের রেকর্ড রাখা ছিল। তা সেসব কুখ্যাত অপরাধীদের অনেক ছবির মধ্যে হঠাৎ একটা ছবি দেখে আর্থার কোনান ডয়েলের মনে হয় ছবিটা যেন ওনার খুব চেনা।

একটু খেয়াল করে দেখে উনি বলে ওঠেন—আরে এ তো জুলসের ছবি, আমার গাড়ি চালাত। ওর ছবি এখানে কী করে?

ডক্টর লোকার্ডও ওনার এই কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যান। বলে ওঠেন—হ্যাঁ, ওর নাম জুলস বোনেটই বটে। কুখ্যাত অপরাধী। অনেকগুলো গাড়ি চুরি, খুন, নানান ধরনের অপরাধের জন্য অবশেষে ধরা পড়ে। আমার টেকনিকের উপরেই নির্ভর করে ওকে আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের ধরা হয়। গাড়ি ব্যবহার করেও অনেক খুন করত জুলস।

কিছুদিন পরে জানা যায় যে জুলস শুধু আর্থার কোনান ডয়েলের গাড়িই চালায়নি, আরেকজন বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্টের গাড়িও তার পরে চালাত। তিনিও টের পাননি যে তার ড্রাইভার এত বড় অপরাধী।

এটাই মজা। যত বড় ডিটেকটিভই হোক না কেন, অপরাধীকে ধরা অত সহজ হয়ে ওঠে না। সেই অপরাধী সামনে থাকলেও অনেক সময় বোঝা যায় না।—একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল—দেখিস, এর জন্য তোরা আবার শার্লক হোমসের বই পড়া ছেড়ে দিস না।

—বলো কী অনিলিখাদি?—পাশ থেকে তন্ময় বলে উঠল।—শার্লক হোমসের স্রষ্টাও এরকম ঠকে গিয়েছিল। নাহ, আর শার্লক হোমসই পড়ব না। আচ্ছা, ওই ডক্টর লোকার্ড কে ছিলেন বলো তো?

—ওই যে বললাম। ডক্টর এডমন্ড লোকার্ড হলেন আধুনিক ফরেনসিকসের প্রবক্তা। উনিই প্রথম ফরেনসিকসের সেই বিখ্যাত নীতির কথা বলেন—'every contact leaves a trace.' বা 'প্রত্যেক স্পর্শ অপরাধীর প্রমাণ রেখে যায়।'

আজও এটাই হল অপরাধী খুঁজে বার করার মূল মন্ত্র। ফরেনসিকসের ভিত্তি। খুনির আঙুলের ছাপ কাচে থেকে যায়, কিংবা সে যে পথে এসেছে, সেখানে পায়ের ছাপ থেকে যায়। কখনও মৃতের গায়ে লেগে থাকা ফাইবার থেকে অপরাধীকে খুঁজে বার করা হয়। কখনও-বা যা দিয়ে খুন করা হয়েছে, তার মধ্যেই অপরাধীর পরিচয় লুকিয়ে থাকে।

—তা এখানে তো কোনও প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।—আমি আবার মূল আলোচনায় ফেরার চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ, সেটাই তো চিন্তার কথা। তবে কিছু না কিছু শিগগিরি পাওয়া যাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে আসল প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

—কীরকম?

—এক, খুনগুলোর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে? মনে তো হয় না। তাহলে খুনির উদ্দেশ্য কী? দুই, আর সবথেকে বড় প্রশ্ন, যারা খুন হয়েছে তাদের সবাইকে ঠিক তার আগের রাতে বা কয়েক ঘণ্টা আগে সুস্থ স্বাভাবিক দেখা গেছে, তা হলে এত তাড়াতাড়ি তারা কী করে কঙ্কালে পরিণত হল? জানিস তো মৃত্যুর পরে মৃতদেহে কি হয়?

—রিগর মরটিস?—অর্ধেক শোনা দুটো শব্দ ছুড়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করল প্রতীক।

—ভুল বলিসনি। মৃত্যুর পরে আমাদের শরীরে পেশিতে নুন এসে জমে। এটা মৃত্যুর প্রায় বারো ঘণ্টা বাদে শুরু হয়। আর তার পরে আরও বারো ঘণ্টা জুড়ে এটা সবথেকে বেশি বোঝা যায়। এসময়ে প্রথমে মুখের পেশি, তার পরে হাত, তারপরে পায়ের পেশিগুলো ক্রমপর্যায়ে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়। তার পরে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাসলগুলো শিথিল হতে থাকে। একেই বলে রিগর মরটিস।

কখন মৃত্যু হয়েছিল তা বুঝতে রিগর মরটিস সাহায্য করে। শরীরের উষ্ণতা থেকে, মৃতদেহে পাওয়া পোকার লার্ভা থেকে, কখন মারা গিয়েছিল তা আন্দাজ করা হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা হল অন্য। মৃত্যুর পরে শরীরে তো আস্তে আস্তে পচন শুরু হবে। হঠাৎ করে তো আর কঙ্কালে পরিণত হতে পারে না। এক্ষেত্রে সেটাই হল সবথেকে অবাক ব্যাপার। সেটা বোঝা গেলেই অর্ধেক রহস্য সমাধান হয়ে যাবে।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল—তবে এটা নিশ্চিত যে এটাই শেষ খুন না। আরও খুন হবে। আর আমার মন বলছে, এসব মৃত্যু যতই সম্পর্কহীন মনে হোক না কেন, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও কারণ আছে। আর সেটাই বার করতে হবে।

এতটা বলে অনিলিখা আবার অন্যমনস্ক হয়ে অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে আবার পরে নিল। আজকাল যখনই অনিলিখা খুব গভীরভাবে কোনও কিছু চিন্তা করে, এই আংটি খোলা-পরা করতে থাকে, দেখেছি।

২

জানলার বাইরের আকাশে আবিরের নানান রং। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে দিগন্তরেখা নানান রঙের তুলির আঁচড় কাটতে ব্যস্ত। আর সেই রঙের খেলা দেখতে কখনও উটে চড়ে, কখনও কচ্ছপে করে, কখনও বা মাথায় পাগড়ি পরে এগিয়ে আসছে মেঘের দল। এখন ইংল্যান্ডে বসন্ত।

এরকম আনন্দের অনুভূতি অপরাজিত বসুর আগে কখনও হয়নি। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে আজকে উনি ট্রিনিটি ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির ও নানান দেশের অগ্রগণ্য গণিতজ্ঞের সামনে ওনার সদ্য আবিষ্কার করা মৌলিক সংখ্যার সূত্র নিয়ে প্রথমবার বললেন। পুরো দেড় ঘণ্টা পিন ড্রপ সাইলেন্স। তার পরে নানান প্রশ্ন।

লেকচার শেষের পরে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল। আর হাততালি চলেছিল একটানা পাক্কা পাঁচ মিনিট। হবে নাই-বা কেন? হাজার হাজার বছর ধরে মৌলিক সংখ্যাকে ঘিরে যা রহস্য ছিল বিশ্বের তাবড় ম্যাথেমেটিশিয়ানদের কাছে, সেই রহস্যই সমাধান করেছেন অপরাজিত।

2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17...এরা সব হল মৌলিক সংখ্যা। যে সংখ্যাকে শুধু সেই সংখ্যা দিয়ে বা 1 দিয়ে ভাগ করা যায়, তাই হল মৌলিক। গ্রিক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড দু-হাজারেরও বেশি বছর আগে বলে গিয়েছিলেন যে যে-কোনও যৌগিক সংখ্যা তৈরি হয় দুটো মৌলিক সংখ্যা গুণ করলে। কথাটা খুব সামান্য শোনালেও আজকের যাবতীয় তথ্য গোপন রাখার বা এনক্রিপশনের মুলে এই মৌলিক সংখ্যা আর ইউক্লিডের বলা এই তত্ত্ব।

এই যে আমরা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কম্পিউটারে কেনাবেচা করছি, তার মূলেও এই মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যার জন্যই বলতে গেলে আমাদের করা যে-কোনও অনলাইন কেনাবেচা বা তথ্য আদানপ্রদান আজ সুরক্ষিত হয়। ছোটবেলায় কলকাতায় একটা নামকরা সরকারি স্কুলে পড়েছেন অপরাজিত। তখনই প্রিয় অঙ্ক শিক্ষকের মুখে শুনেছিল অয়লারের ইকুয়েশন। সেই ইকুয়েশন যা কোন সংখ্যা মৌলিক তা বার করতে পারে। ওনার ফর্মূলা ছিল $f(x)=x_2+x+41$. অয়লারের ফর্মূলা কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যার অনুমান করতে পারেনি। তাই অয়লার সারাজীবন এই মৌলিক সংখ্যার পিছনে ছুটলেও শেষ পর্যন্ত এই মৌলিক সংখ্যার রহস্য ওনার কাছে অধরাই থেকে যায়।

অয়লার একা নন। অয়লার মারা যান 1783 সালে ব্রেন হেমারেজে। ওনার পরেও অনেক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তাদের সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন এই রহস্যের সন্ধানে। কী সূত্রে সব মৌলিক সংখ্যা অনুমান করা যায়। সব কিছুতেই তো একটা প্যাটার্ন থাকে। মৌলিক সংখ্যা কী প্রকৃতির সেই সব নিয়মের উপরে?

জার্মান গণিতজ্ঞ বারনহারড রাইমান থেকে নাৎসিদের কোড যিনি বার করতে পেরেছিলেন এই অ্যালান টিওরিং অব্দি অনেকেই চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু অধরাই থেকে গিয়েছিল সেই রহস্য।

সেই ছোটবেলা থেকেই মৌলিক সংখ্যার নেশা যেন রক্তে ছড়িয়ে পড়েছিল অপরাজিতর। সেই স্কুল, কলেজ, অধ্যাপনা সব জুড়ে শুধু এই মৌলিক সংখ্যা।

2000 সালের পর থেকে এই মৌলিক রহস্য সন্ধানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। যেভাবে অনলাইনের যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন রাখা হয়, তাকে বলে 'পাবলিক কি' এনক্রিপশন।

ধরো, আমি চাই তুমি আমাকে একটা মেসেজ পাঠাবে, আমি ছাড়া আর অন্য কেউ সে মেসেজ পড়তে পারবে না। আমি তোমাকে আমার 'পাবলিক কি'টা দিয়ে দেব। তুমি তার সাহায্যে মেসেজটাকে এনকোড করে আমাকে ফেরত পাঠাবে। এই মেসেজটা অন্য কারুর হাতে গেলেও চিন্তা নেই, সে এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না, কারণ তার কাছে এটা পড়ার জন্য দরকারি অন্য 'প্রাইভেট কি'টা নেই। ওটা শুধু আমার কাছেই আছে আর তার সাহায্যে আমি তোমার মেসেজটা পড়তে পারব। এই নীতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের যাবতীয় RSA অ্যালগরিদম।

কিছুদিন আগে অপরাজিতকে একটা সায়েন্স ফেস্টিভালে এই এনক্রিপশনের বিষয়ে বলতে বলা হয়েছিল। সেখানে ছিল জুনিয়র স্কুলের একদল ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে একজন এসে শেষে সরাসরি বলেছিল যে সে কিছুই বোঝেনি। সত্যিই তো এসব শক্ত কথা কি স্কুল লেভেলে বোঝা সম্ভব?

তার জন্যও অপরাজিত বলেছিল—ধরো আমার ঘরের দামি জিনিসপত্র সব একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলাম। সে ঘরের দরজায় যে তালা, তার দুটো চাবি, দুটোই না থাকলে কেউ তা খুলতে পারবে না। তাই একটা চাবি চুরি গেলেও ক্ষতি নেই। কারণ অন্য চাবিটা শুধু আমার কাছেই আছে। এখানেও ঠিক সেরকম।

এই 'পাবলিক কি' গুলো আসে দুটো খুব বড় মৌলিক সংখ্যাকে গুণ করে। যে দুটো মৌলিক সংখ্যা গুণ করে এই বড় সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তারা হয় 'প্রাইভেট কি', শুধু আমার কাছে থাকা রহস্য উন্মোচনের

চাবি। এই 'প্রাইভেট কি' বার করা আজকের সবথেকে শক্তিশালী কম্পিউটারের পক্ষেও অসাধ্য। কিন্তু কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পিড রোজ বাড়ছে। তাই দরকার পড়ছে আরও বড়, আরও বড় মৌলিক সংখ্যার। আর সেখানেই অপরাজিতের সূত্র আগামী দিনে সারা পৃথিবীর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

এর মধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলা সামান্য ফাঁক থাকায় বাইরের বৃষ্টির শব্দ ভেতর অব্দি আসছিল। বাইরে থেকে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। অনেকটা গন্ধরাজের মতো এর গন্ধ। দেশের কথা মনে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে অর্ধেক জীবন দেশের বাইরে কেটে গেল।

এ আবিষ্কারের পেছনে যে কত মাস কত বছর কেটে গেছে তা অপরাজিতই শুধু জানে। সবাই যখন ছুটির দিনগুলোতে বেড়াতে চলে যেত বাড়ির সবার সঙ্গে, তখনও মুখ গুঁজে এ-রহস্যের অলিগলিতে হারিয়ে গেছে অপরাজিত। এ এক অজানা ভাষা। এ ভাষা একবার জানতে পারলে—তখন খ্যাতি, অর্থের মোহ সামনে আসে না।

কফি খেতে খেতে এসবই ভাবছিল অপরাজিত। চিন্তা ব্যাহত হল। সেক্রেটারি ভিকি এসে জানাল একজন ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভিকি কার্ডটা এগিয়ে দিল। কার্ডটা দেখে একটু অবাক হল অপরাজিত। কোনও নাম নেই। শুধু লেখা 'চিফ সায়েন্টিস্ট নিউ লাইফ'। এনার কি দরকার থাকতে পারে ওর সঙ্গে? যাই হোক দেখা করতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। এমনিতেও গত কয়েকদিন এত জন দেখা করতে এসেছে, এত জন শুভেচ্ছাবার্তা দিতে এসেছে, এক্ষেত্রেও যে সেরকমই কিছু হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩

দু'মিনিট বাদে ভিকি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মাঝারি হাইট। চোখে গোল চশমা। চুল দাড়ি সাদা। ট্যান্ড চামড়া। দেখে মনে হয় বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে। সে তুলনায় যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। গায়ে দামি নীল সুট, আকাশি টাই।

হ্যা-আ-আ-লো—একটা অদ্ভুত সুরেলাভাবে কথাটা বলে ভদ্রলোক অপরাজিতর করমর্দন করল। এমন ভাবে 'হ্যালো' বলল যে অন্য কেউ বললে মনে হত, কেউ যেন ইয়ার্কি করছে।

তার পরে অপরাজিতর টেবিলের উলটো দিকের একটা চেয়ার টেনে ভদ্রলোক বলতে শুরু করেন—আপনার কাজে আমি মুগ্ধ। আপনি যা বললেন তার আসল তাৎপর্য বুঝতে লোকেদের বহুবছর লেগে যাবে। এটা একটা দু-হাজার বছরের রহস্যের সমাধান শুধু নয়, এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তার থেকে আরও অনেক বেশি।

দুটো কফি আনতে বলে দিল অপরাজিত। ভদ্রলোককে বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছিল ওর।

ও বলে উঠল—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি তো শুধু মৌলিক সংখ্যা বার করার একটা সূত্র বলেছি একটা প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সত্যিকারের প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এই প্যাটার্নটা কি অন্য কিছু বোঝায়? এ যেন কোনও অজানা মহাজাগতিক সঙ্কেত—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অপরাজিত। ফের বলে উঠল—তা আপনি—মানে আপনার নামটা তো কার্ডে দেখলাম না।

—এটাই কি ঠিক নয়? একজন বিজ্ঞানীর পরিচয় তার কাজে। তার নাম কী তাতে কী এসে গেল? তার কাজ শুধু বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তা আপনার জন্য বলি। আমার নাম ডেভ। আমি 'নিউ লাইফ' সংস্থার অধিকর্তা ও চিফ সায়ান্টিস্ট। সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। আমি চাই আপনি আমাদের সংস্থায় মুখ্যপরামর্শদাতা ও পার্টটাইম ডিরেক্টার হিসেবে যোগ দিন।

—আমি? তা আপনাদের গবেষণার মূল বিষয়?

—আমরা নতুন মাইক্রোবায়োলজিকাল বা আণুবীক্ষণিক প্রাণ তৈরির চেষ্টা করছি।

—মানে? নতুন প্রাণসৃষ্টি। আমাদের হাতে তৈরি হবে নতুন আণুবীক্ষণিক প্রাণী? যেমন বিজ্ঞানী ভেন্টার-এর টিম সাম্প্রতিককালে করেছেন?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ভেন্টার খুব কম সংখ্যক জিন আছে এরকম কিছু ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে দরকারি জিনগুলো বেছে নেন। একবারে সেটা সম্ভব হয়নি। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, মূলত প্রসেস অফ এলিমিনেশনের ভিত্তিতে ওনারা কৃত্রিমভাবে কীভাবে প্রাণ তৈরি করা যায় তার সন্ধান পান। মাইক্রোব তৈরি করেন।

উনি কিন্তু জানতেন না, যে কৃত্রিমভাবে প্রাণ—ওই মাইক্রোব তৈরি করার জন্য ঠিক কোন জিনটা থাকা দরকার, আর তা কী জন্য জরুরি।

আমাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যে কৃত্রিম মাইক্রোব তৈরি করেছি, তার প্রত্যেকটা জিন কীসের জন্য তা আমরা জানি। অন্ধকারে হাতড়ানো নয়। এবার আমরা তার পরবর্তী পর্যায়ে কাজ করছি।

—পরবর্তী পর্যায়? মানে?

—আমরা শুধু কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করতেই চাই না, আমরা চাই তাদেরকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করতে।

যেরকম চাই, ঠিক সেরকম ভাবে যেন আমাদের হাতে তৈরি এই প্রাণী কাজ করে। ওরা থাকবে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু নামকরা জেনেটিক সায়েন্টিস্ট আছেন, নামকরা সিনথেটিক বায়োলজিস্টরা, বায়োটেকনলিজিস্টরা আছেন। এখন শুধু আপনার সাহায্য পেলেই হবে।

অবাক হয়ে বলে উঠল অপরাজিত—কিন্তু আমি তো বায়োলজিস্ট নই। আমি কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।

হেসে উঠল ডেভ। বলে উঠল—সে ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন না। এটুকু বলব প্রাণের সন্ধান অনেকটা কোড ব্রেকিং-এর মতো। ধরুন আপনাকে হাজার হাজার বুদ্ধিমান প্রাণী, তাদের চরিত্র আর তাদের জিনের গঠন দিয়ে দেওয়া হল। এবার আপনার কাজ হল তার ভিত্তিতে বোঝা কোন জিন ঠিক কীভাবে কাজ করে। এটা বোঝার জন্য দরকার আপনার স্কিল, আপনার প্যাটার্ন বোঝার ক্ষমতা।

একটু থামল ডেভ।—আমি জানি আপনি অর্থের জন্য একাজ করবেন না। না হলে বলতাম, আমরা যা করতে চলেছি তা আমাদেরকে পৃথিবীর সবথেকে ধনী করে তুলতে পারে। আমরা আমাদের নিজস্ব জিন ব্যাঙ্ক তৈরি করতে পারি। আর প্রয়োজন মতো তা দিয়ে নতুন নতুন প্রাণী তৈরি করতে পারি।

এভাবে তৈরি একটা মাইক্রোব দিয়ে পরিবেশ থেকে ক্ষতিকর গ্যাস সরিয়ে নিতে পারি, কোনও দামি ড্রাগ তৈরি করতে পারি, এমনকী যুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারি। এ আবিষ্কারের মূল্য আর চাহিদা কী হতে পারে ভাবতে পারছেন? তবে সবার আগে আমার লাগবে আপনার মতো সেরা ব্রেন, কোড ব্রেকিং ক্ষমতা আর অঙ্কের পারদর্শিতা। আমরা দেখেছি প্রাণ তৈরির রহস্যের মূলে আছে এই মৌলিক সংখ্যা। পরে সেকথা বলব।

একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠল—যদি আপনি সফল হন, পৃথিবী আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে আপনার এই আবিষ্কারের জন্য। অনেক তো বললাম। এবার আমাদের সঙ্গে আপনার কাজ করতে কোনও আপত্তি নেই তো?

চুপ করে বসে থাকল অপরাজিত। জানাল—আরেকটু সময় চাই ভাবার জন্য।

—হ্যাঁ, তা নিন না। আমি আপনাকে কাল ফোন করব। আপনি সবে ঘাসে পা ফেলেছেন। এবার আপনার ছোটার সময়, ঘরে বসে থাকবেন না।

এরকম অত্যাধুনিক বায়োটেকনোলজি ল্যাব আগে কখনও দেখেনি অপরাজিত। চারদিকে অত্যাধুনিক নানান যন্ত্রের ছড়াছড়ি। লন্ডনের উপরেই যে এরকম একটা ল্যাব থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। বেশ কিছু রোবট কাজ করছে।

একটা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখতে বলল ডেভ।

—কী দেখছেন?

—ছোট ছোট অনেকগুলো টিউব। নড়ছে যেন।

—এটা কি বলতে পারবেন?

ঘাড় নাড়ল অপরাজিত। জানে না।

—এটাই হল ভেন্টারের পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি সেই মাইক্রোব সিন 3.0, যার মধ্যে মোটে 473টা জিন আছে। 'মাইকোপ্লাজমা মাইকয়েডস' নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার থেকে বিভিন্ন জিন এক এক করে বাদ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ভেন্টারের টিম দেখেন যে ওই 473টা জিন থাকলে তা দিয়ে একটা নতুন প্রাণ তৈরি করা সম্ভব।

নাম দেন সিন 3.0, কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো জিনের কী কাজ, সেটা উনি আদৌ বোঝেননি। তবে না থাকলেও দেখেছেন সেক্ষেত্রে সেই মাইক্রোবে প্রাণ সৃষ্টি হয় না।

বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে অনেক হইচই শুরু করে। বলা হয় মানুষ প্রথমবার কৃত্রিমভাবে প্রাণ তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি যদি প্রাণ তৈরি করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা জিনের অর্থ বুঝে তা দিয়ে তৈরি করতে হবে। যেমন আমি করেছি 347টা জিন দিয়ে। এর থেকে কম জিন দিয়ে প্রাণ তৈরি করা যায় না, সেটা আমি দেখেছি।

—মৌলিক সংখ্যা। 347 হল মৌলিক সংখ্যা।—আস্তে আস্তে বলে উঠল অপরাজিত

—একদম ঠিক। এবার বুঝতে পারছেন মৌলিক সংখ্যা কত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে-ক'টা মাইক্রোব তৈরি করেছি শুধু দরকারি জিন মিলিয়ে, তাদের সবক্ষেত্রেই দেখছি, তাদের জিন সংখ্যা মৌলিক। 473 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয়। যেটা প্রমাণ করে যে ভেন্টার সিন 3.0 মাইক্রোবটা আরও কম সংখ্যক জিন দিয়েই তৈরি করতে পারতেন।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, যে প্রাণীদের মধ্যে যৌগিক সংখ্যার জিন থাকে, শিওরলি তাদের মধ্যে কিছু অদরকারি জিন আছে। তা যা বলছিলাম। আমরা যে মাইক্রোব তৈরি করেছি, তার প্রত্যেকটা জিন কী কাজ করে তা আমার জানা। কিন্তু এবার আমরা এর পরের ধাপে যেতে চাই, যেখানে আমি যা চাই, ঠিক সেই ক্ষমতাই থাকবে এই মাইক্রোবের মধ্যে।

আর তাই এর উপরে আমরা আরও বিভিন্ন জিন ঢুকিয়ে দেখছি, তাতে কী হয়। ধরো আমরা চাই একটা মাইক্রোব আগ্নেয়গিরির মধ্যে বেঁচে থাকুক। সেক্ষেত্রে কী জিন লাগবে সেটা যাতে আমরা বার করে, এই মাইক্রোবকে ঠিক সেই ক্ষমতা দিতে পারি, সেটাই হবে আমাদের চেষ্টা। আর সেখানেই আপনার মতো অসাধারণ গণিতজ্ঞর সাহায্য দরকার।

একটা কম্পিউটারের কাছে এগিয়ে গেল ডেভ। ফের বলে উঠল— আমরা জেনোম ডিজাইন করি কম্পিউটারে আর তার পরে তা টেস্ট টিউবে রাখি। আমরা হাজার হাজার মাইক্রোবের ব্যবহার, চরিত্র, ক্ষমতা আর তাদের মধ্যে কী জিন আছে, তা দেখে বিভিন্ন ধরনের জিন বার করার চেষ্টা করছি। ঠিক কোনটার জন্য কী হয়, সেটা বার করা খুব শক্ত কাজ আর তাই সে কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না। আমার ধারণা আপনার সাহায্যে সে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি এগোবে।

চ্যালেঞ্জটা হল এ ধরনের বেসিক মাইক্রোব থেকে পরের ধাপের উন্নত প্রাণীতে যাওয়া। তার জন্য অবশ্য মানুষের মতো 20000 জিন দরকার হবে না, আমার বিশ্বাস কম জিনেই হবে।

—তা যত জিন থাকে, সে প্রাণী কি তত বুদ্ধিমান হয়?

—না, না। একেবারেই না। প্যারিস জাপানিকা বলে একটা খুব রেয়ার জাপানি ফুল আছে, যার জিনের সংখ্যা মানুষের 50 গুণ। তাই জিনের সংখ্যা বেশি মানেই যে সে প্রাণী বেশি বুদ্ধিমান সেটা ভাবার কিছু নেই। তার একটা কারণ একটা বড় অংশ জেনাম (genome) করে না। জিনের সংখ্যা মৌলিক না হলেই বুঝতে হবে তার মধ্যে অনেক অদরকারি জিন আছে। কী রহস্য তা বুঝতে পারছেন তো? ঈশ্বর হল সবথেকে বড় গণিতজ্ঞ।—বলে ডেভ হেসে উঠল।

একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠল—কী ঠিক করলেন? আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন তো?

অপরাজিত মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভ ভারী উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—রাইট ডিসিশন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আপনি এ পর্যন্ত যা করেছেন, তা সবই প্রায় লজিকের উপর নির্ভর করে। এবার কিন্তু আপনাকে এই লজিকের জগতের বাইরে যেতে হবে। শুধু কল্পনাই আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে।

চলুন, আপনাকে ইভলিউশনারি বায়োলজিস্ট স্যামের সঙ্গে আলাপ করাই। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে জীবজগতে যা পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের এই 'নতুন প্রাণ' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাকে কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক পেছনে ফেলে দিতে পারে।

—কিন্তু তাতে এমনও তো হতে পারে যে আমরা যা চাই, তার থেকে অন্যরকম কোনও প্রাণী তৈরি হয়ে গেল। আর আমরা তার উপরে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারালাম।

—হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। তবে আমার মনে হয় আমরা সেই জিনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, যা দিয়ে কোনও প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সেটাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরাই আমাদের ঈশ্বর।

কথা বলতে বলতে অপরাজিতকে নিয়ে ল্যাবের ভেতরদিকে ডেভ এগিয়ে গেল।

৫

বাইরে বেশ কয়েকবার কলিংবেলের আওয়াজ। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুচরিতা দেখল বাবা এসেছে। কিন্তু কীরকম উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা। উশকোখুশকো চুল। গাড়িটা দূরে কোনওরকম পার্ক করে রাখা। যেন কোনও কিছু তাড়া করেছে পেছনে।

তাড়াতাড়ি দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল সুচরিতা। উপর থেকে মা'র গলা এল—কে? কে এল দেখত।

—বাবা।

—সে কী? এত তাড়াতাড়ি? এতবার বেল দিচ্ছে সমানে।

এর মধ্যে আরও দুবার বেল বেজে উঠল।

ঘরে ঢুকেই অপরাজিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—একটু কথা আছে। তাড়াতাড়ি এসো।

—দাঁড়াও, একটা কাজের মধ্যে আছি। পাঁচ মিনিট দাও।

—না, এখনই এসো। খুব জরুরি আলোচনার দরকার আছে।

অবাক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কেয়া।

—কী ব্যাপার?

—আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। ভারতে।

—সে কী? কেন? সুচরিতার তো সামনেই জি সি এস ই পরীক্ষা। এখন আমরা কী করে যাব?

—একটু থেমে অপরাজিত বলে উঠল—তুমি কি চাও আমি জেলে যাই? বা আমাকে কেউ মেরে ফেলুক?

—মানে? কী হয়েছে?

একটু থামল অপরাজিত। গম্ভীর গলায় বলে উঠল—আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। জানি না দেশে গিয়েও রেহাই পাব কিনা। কিন্তু অন্তত কিছু দিন সময় পাব, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার।

—তা কী করেছ তুমি?

—আমি বেশ কয়েকমাস আগে একটা সংস্থার অনুরোধে জাল ইউরো নোট শনাক্তকরণের জন্য একটা যন্ত্র তৈরি করার রিসার্চের কাজ করেছিলাম। লাইট সার্কিট, আল্ট্রাভায়োলেট রে, ম্যাগনেটিক ও লেসার সেন্সরের সাহায্যে নোটের উপরে থাকা প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে কীভাবে একটা জাল নোটকে কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আলাদা করা যায়, সেটাই বোঝা ছিল আমার কাজ। তার উপরে ভিত্তি করে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বার করার লজিকও আমি আবিষ্কার করি। কিন্তু আমি এটা কখনও ভাবিনি যে আমার বার করা লজিক ঠিক উলটো কাজে ব্যবহার হবে। সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে আরও উন্নত জাল নোট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এমন জাল নোট যা কোনও যন্ত্রে ধরা পড়বে না।

—তা তুমি কী করে জানলে যে তোমাকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে?

—জানি না, কালকে এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়ে দেখি আমাকে টাকা তুলতে দিচ্ছে না। আজকে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। সেখানেও টাকা তুলতে পারলাম না। কাউন্টারের লোকটায় মুখ দেখে বুঝলাম সে-ও কিছু বুঝছে না। আমাকে শুধু বলল—কিছু একটা মেসেজ পাচ্ছে। তাই ও আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে দিতে পারছে না।

ছেলেটা নেহাত ট্রেনি ছিল, বাচ্চা ছেলে, তাই বুঝতে পারেনি। আমি এক ঝলক পাশ থেকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কী ঘটনা। আমার অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটির কারণে MI 6 থেকে ব্লক করেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু স্যামকে ফোন করলাম। ও তো MI 6-এ আছে। কী হতে পারে জানার জন্য। ও এমনিতে বলত না। কিন্তু আমাকে বহু বছর ধরে ভালো করে জানে বলেই বলল। যা জানাল তা ভারী মারাত্মক।

জাল টাকা তৈরির একটা চক্র কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে। আমার নামও নাকি ওতে জড়িয়ে আছে। আর তাই আমার নাম এখন সন্দেহভাজন অপরাধীদের তালিকায় ঢুকে গেছে। স্যাম না থাকলে হয়তো জানতেও পারতাম না। আমাকে গ্রেফতার এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওরা হয়তো আমার বিরুদ্ধে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করছে।

একটু থামল অপরাজিত। ফের বলে উঠল—আসলে এর পেছনে কে আছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ওরা আমার গবেষণার অপব্যবহার শুরু করেছিল। আমি আগে তা বুঝতে পারিনি। ওদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলার পরে আর কাজ করব না বলাতেই ওরা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে, যাতে আমি আবার ওদের কাছে ফিরে যাই। বাইরের আর কেউ যেন এটা না জানতে পারে।

—কে? কারা এরা?

—এদের প্রধান ডেভ। থাক, তোমাদের আর জেনে দরকার নেই। পরে বলব—আপাতত আমরা এখনই দেশে ফিরে যাব। ওখানে থেকেই প্রমাণ করব যে আমি এ বিষয়ে কোনওভাবে জড়িত নই। এ বিষয়ে সত্যি বুঝতে পুলিশের বেশি সময় লাগবে না। তখন কিছুদিন পরে ফিরে আসা যাবে।

—কবে এখান থেকে দেশে ফেরার কথা ভাবছ? পরের মাসে?

—পরের মাসে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ। আজকেই। এখনই আমরা বেরিয়ে যাব। স্যাম বলল কালকের পরে এখান থেকে বেরোনো শক্ত হয়ে যাবে। আজকেই আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তার পরে দেখা যাক।

সকালে চা-এর সঙ্গে খবরের কাগজ পড়াটা অনিলিখার বহুদিনের অভ্যেস। তবে আজকাল বেশিরভাগ খবরেই বিশেষ আগ্রহ পায় না অনিলিখা। যত নেগেটিভ খবর। আচ্ছা, দেশের সব লোকজন কি এতটাই খারাপ। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ তো ভালো কাজ করছে। কই তাদের নিয়ে তো আর খবর থাকে না কাগজে। ভালো লোকেদের কাজের খবর আরও পাঁচটা লোককে ভালো কাজ করতে উৎসাহ দেবে।

যদি অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে এখানকার খবর দেখে, সে ভাববে পৃথিবীতে খুন-জখম-হিংসা আর সিনেমা ছাড়া আর কিছু হয় না।

এসব সত্ত্বেও রোজ কাগজটা না পড়লে যেন সকালটা শুরু হয় না। আজকের কাগজের প্রথম পাতার দিকে চোখ পড়তেই অনিলিখা চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অপরাজিত বসু মারা গেছেন তার কলকাতার বাড়িতে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 55 বছর। মৌলিক সংখ্যার উপরে ওনার বিখ্যাত গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে কাগজে।

এক বছর আগে বেশ কিছুদিন ধরে ওনার নাম বেশ কয়েকটা কাগজের শিরোনামে ছিল। মৌলিক সংখ্যার একটা জটিল সমীকরণ উনি তৈরি করেন, যা দিয়ে সব মৌলিক সংখ্যা অনুমান করা সম্ভব। দেশবিদেশে বেশ কিছু পুরস্কারও পান এজন্য। অনিলিখার সঙ্গে অপরাজিত বসুর পরিচয় অবশ্য এই সূত্রে নয়। অনেক দিন আগে থেকেই ওনার কাজের সঙ্গে অনিলিখা পরিচিত। ওনার মতো এত ভালো কোনও গণিতজ্ঞ ভারত কেন সারা পৃথিবীতে বিরল। অপরাজিতবাবুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখাও হয়েছে অনিলিখার। ভদ্রলোক তো ইংল্যান্ডে ছিলেন, কলকাতায় এলেন কবে?

যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে ওনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করা শক্ত হল না অনিলিখার পক্ষে। ঠিক করল একদিন অফিস ফেরত ওনার বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবে।

পরের কয়েকদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় পেল না। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে এক শনিবার সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল অনিলিখা। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছে অপরাজিত বসুর পুরোনো বাড়ি। বনেদি যৌথ পরিবার। এই বাড়িতে অপরাজিতের দুই ভাই, তাদের পরিবারও থাকেন। নিরিবিলি কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। কেউ না কেউ সারাক্ষণ ঘরে আসছে। তবু শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে ওনার মেয়ে ও স্ত্রীকে আলাদাভাবে পাওয়া গেল।

মেয়ের নাম সুচরিতা। হঠাৎ করে দেখলে বিদেশিনী মনে হয়। খুব ফরসা, লম্বা অ্যাথলেটিক চেহারা। বাড়িতে একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্টের উপরে টি-শার্ট পরে আছে। অপরাজিতবাবুর স্ত্রী একটা সাদা শাড়ি পরে আছেন, যদিও পরার ধরন দেখলে বোঝা যায়, শাড়ি পরতে অভ্যস্ত নন। বহুদিন বাইরে ছিলেন। এখন এখানে এসে কলকাতার অনিয়মের জীবনে ধাতস্থ হতে যে একটু সময় লাগছে, সেটা ওনার কথাবার্তায় পরিষ্কার বোঝা যায়। অনিলিখার নামের সঙ্গে ওনারা দুজনেই পরিচিত। অপরাজিতবাবুও নাকি অনেক সময় অনিলিখার কথা বলতেন।

তা যাই হোক, কথায় কথায় অনিলিখাই বলে উঠল—হঠাৎ করে এত কম বয়সে যে উনি মারা যাবেন, ভাবাই যায় না। উনি তো শেষ অব্দি খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন। শরীর খারাপ, এরকমও কখনও শুনিনি।

কেম্ব্রিজে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করতেন শুনেছি। তা হঠাৎ করে কী হল?

অনিলিখা লক্ষ করছিল অপরাজিতবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ এ ব্যাপারে কথা বললেও ওনার মেয়ে সুচরিতা শুরু থেকেই চুপচাপ।

অনিলিখার মনে হল সুচরিতা যেন কিছু একটা বলতে চায়। দ্বিধা করছে। সুচরিতাকে লক্ষ করে অনিলিখা বলে উঠল—এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে চাও? আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারো। আমি কাউকে জানাব না। সত্যি বলতে কী ওনার মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে হয়নি, তা তোমরা সরাসরি না বললেও, তার আভাস ইতিমধ্যেই তোমাদের কথায় পেয়েছি।

সুচরিতা একবার মা'র দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ইংরেজি টানে বাংলায় বলে উঠল—আমার মনে হয় না আমার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। আমরা হঠাৎ করে ইংল্যান্ড থেকে চলে আসি। বলতে পারেন এক দিনের মধ্যে। আসলে বাবা হঠাৎ জানতে পারে যে বাবাকে একটা জাল নোটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে পুলিশ সন্দেহ করছে।

—উনি? জাল নোটের ব্যবসায়?

—বুঝতেই পারছেন এটার মধ্যে যদি কোনওভাবে বাবার মতো মানুষের যুক্ত থাকার কোনওরকম চান্স থাকত, তাহলে আমিও একথা আপনাকে বলতাম না। বাবা ওর সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত থাকতে পারে না। কেউ ইচ্ছে করে বাবাকে এ ব্যাপারে ফাঁসিয়েছিল। কিন্তু সেই অপরাধে ধরা পড়ার ভয়ে, দুর্নাম হওয়ার ভয়ে বাবা সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসে। এখানে এসে কিছু নামকরা আইনজ্ঞর সঙ্গে এ ব্যাপারে কী করা যায়, তা নিয়ে পরামর্শ নিচ্ছিল। ভেবেছিল যে এর সঙ্গে যুক্ত নয় তা শিগগিরি প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু সেই সময়টুকু বাবা শেষ পর্যন্ত পেল না।

—তা ওনার মৃত্যুর কারণ কী বলছে ডাক্তার? ভাইরাল ফিভার থেকে?

সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে সুচরিতা বলে উঠল—এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলি। আমি আর বাবা মেট্রোতে করে স্প্লানেড থেকে ফিরছিলাম। ট্রেনে ভিড় ছিল। হঠাৎ বাবার পায়ে যেন ছুঁচের মতো কিছু একটা বিঁধল। বাবা তখন আমায় কিছুই বলেনি। স্টেশনে নামার পরে বাবা আমাকে একটু দেখতে বলে। দেখি পায়ের মোজা যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু উপরে, হাঁটুর একটু নীচে, সামান্য লাল দাগ। ভেবেছিলাম কোনও পোকা কামড়েছে। তখন বাড়ি ফিরতে তেমন কোনও অসুবিধেও হয়নি। বাড়ি আসার পর বমি শুরু হয়। খুব জ্বরও আসে। আর ভোররাতের দিকে আমরা ডাক্তার ডাকি। উনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু সে সময় আর আমরা পাইনি। তার আগেই বাবা মারা যায়।

—তা ডাক্তার দেখে কিছু সন্দেহ করেনি?

—না, ডাক্তার সেরকম কিছু বলেনি। এভাবে হঠাৎ জ্বরে মৃত্যুর কারণও বুঝতে পারেনি। আমরাও ভয়ে ভয়ে ছিলাম, যে বাবার তো মৃত্যু হয়েছেই, এসবের মধ্যে দিয়ে আবার বাবার নামে যে অভিযোগটা উঠেছিল সেটা জানাজানি না হয়ে যায়। বাবার মতো মানুষের কোনও বদনাম হোক, এটা আমরা চাইনি। তাই এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। তা আপনার কি মনে হয় অনিলিখাদি? বাবাকে কি খুন করা হতে পারে? মেট্রোর ওই ঘটনার সঙ্গে কী বাবার মৃত্যুর কোনও যোগাযোগ আছে?

—কী জানি? হতেও পারে। পোস্ট মর্টেম করলে হয়তো জানা যেত, ওনার রক্তে কোনও বিষ ছিল কিনা। এরকম তো হতে পারে যে মেট্রোতে ওনার পায়ে কোনও বিষ ইনজেক্ট করা হয়েছিল।

—কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে কীভাবে বিষ ঢোকাবে? আর বাবা তা টের পাবে না?

—সে অনেক ভাবে করা সম্ভব। জুতোর সামনে ধারালো কিছু লাগিয়ে, ছাতা দিয়ে, আরও নানান ভাবে ইনজেক্ট করা যেতে পারে। এরকম আগেও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে কোনও সন্দেহজনক কাউকে দেখেছিলে আশেপাশে?

—সেদিন বেশ ভিড় ছিল। আর বাবা তো সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেওনি। আমি একটু দূরে লেডিজ সিটে বসেছিলাম। নামার পরে বলেছিল। তাই খেয়াল করিনি। তা এরকম কোনও ঘটনা কি আগে কখনও ঘটেছে?

—হ্যাঁ, সেরকম অনেকই হয়তো হয়েছে। বেশিরভাগ সময় এই সব গুপ্ত হত্যার কথা জানাও যায় না। তবে একটা ঘটনা তো অনেকেই জানে।

যদ্দুর মনে পড়ছে 1978-এর সেপ্টেম্বরে জর্জি মারকভ নামের এক প্রবাসী বুলগেরিয়ান লন্ডনে এভাবে খুন হয়েছিলেন। উনি একটা বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবিসিতে কাজ করতেন। হঠাৎ ওনার মনে হয় পায়ের উরুতে বোলতার মতো কিছু একটা কামড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন ওনার পাশেই একজন লোক। রাস্তায় পড়ে যাওয়া ছাতা তুলছে। তখন কোনও সন্দেহ হয়নি মারকভের। রাতে ওনার জ্বর আসে। বেশ কয়েকবার বমিও হয়। শেষে ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সব রকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও চারদিন বাদে উনি মারা যান।

পরে ওনার পায়ের উরুর কাছে একটা ছোট ফুটো পাওয়া যায়। সেখানে একটা খুব ছোট প্যালেটও পাওয়া যায়। প্যালেটের মধ্যে ছোট ছোট ফুটো ছিল। সম্ভবত সেখানে রাইসিন-এর মতো কোনও মারাত্মক বিষ কম পরিমাণে রাখা ছিল। আর ওখান থেকে আস্তে আস্তে ওই বিষ বেরিয়ে এসে রক্তে মিশেছিল।

পরে জানা যায় জর্জি মারকভকে মারার পেছনে তখনকার বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের হাত ছিল। ওনাকে রাজনৈতিক কারণে মারা হয়, কারণ উনি এভাবে বিষ প্রয়োগে কীভাবে বুলগেরিয়া সরকার রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের গোপনে হত্যা করছে তা নিয়ে লিখেছিলেন।

এটাই একমাত্র কেস নয়। এরকম হয়তো আরও অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। কিন্তু কখনও তা প্রকাশ্যে আসেনি।

কথা শুনতে শুনতে কেয়া দেবী ও সুচরিতা দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। দুজনের চোখেই জল। কেয়া দেবী কিছু একটা বলতে গেলেন, শোনা গেল না।

সুচরিতা বলে উঠল—কিছু করা যায় অনিলিখাদি? ওরা যে শুধু বাবাকে মেরেছে তাই না, বাবাকে একটা বড় চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে ওদের জন্য। ওরা আমাদের সব সুখ শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। শেষ দিকে দেখেছি বাবা কোনও কাজও করতে পারত না এই অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে। আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি পারবেন এব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে? আপনার তো এত জানাশোনা।

—অবশ্যই চেষ্টা করব। এত বড় অন্যায় যারা করেছে, তাদেরকে তো আর এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তবে এর পেছনে একটা খুব বড় শক্তিশালী গ্রুপ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। সবই যদিও অনুমান, তবু এ ধরনের চক্রান্তে ওনার মতো একজন বিশ্বের অগ্রগণ্য ম্যাথামেটিশিয়নকে জড়ানো, তার পরে অন্য দেশে এসে ওনাকে হত্যা করা, এসব তো আর ছোট কোনও গ্রুপের কাজ হতে পারে না। ওনাকে আমি দেখেছি, ওনার মতো মানুষের শত্রু হওয়াও খুব কঠিন কাজ। তোমাদের কি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়?

—ইংল্যান্ড থেকে আমরা যেদিন হঠাৎ ফিরে আসি সেদিন বাবা ডেভ বলে কারুর কথা বলেছিল। কিন্তু তার বেশি আর কিছু বলেনি। বাবা এমনিতে কাজের কথা আমাদের সঙ্গে একদমই বলত না।

—আচ্ছা, বাবা মারা যাওয়ার আগে এখানে, মানে সেদিন রাতে তোমাকে কিছু বলেছিল?—অনিলিখা সুচরিতাকে ফের প্রশ্ন করে।

—না, শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। তবে জ্বরের মধ্যে কিছু একটা যেন বলতে চাইছিল। শেষের দিকে মাথাও ঠিক ছিল না। তা না হলে এত কথা বলার থাকতে, আমাকে একটা সুডোকুর বই শেষ মুহূর্তে ধরিয়ে দেয় আর বলে যত্ন করে রাখতে।—সুচরিতা বলে ওঠে।

—বইটা আছে? একটু দেখি।

—আমি আসলে কখনও সুডোকু খেলিনি আগে। তাই বইটা সরিয়ে রেখেছিলাম। দেখি পাই কিনা।

—একটু খুঁজে দেখো। আমার ওটা অবশ্যই লাগবে। আমি নিশ্চিত ওটা তোমাকে তোমার বাবা শুধু শুধু দেননি। নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলার ছিল ওনার। যেটা উনি ইচ্ছে করে মুখে বলে যেতে চাননি তোমাদের

নিরাপত্তার কথা ভেবে। আর বিশেষ করে যখন সুডোকু খেলো না, তখন তো শুধু শুধু উনি এটা দেবেন না।

খানিক বাদে সুচরিতা একটা পাতলা হলুদ রঙের বই নিয়ে আসে। উপরে লেখা 'অ্যাডভান্সড সুডোকু'। বইটা নেড়েচেড়ে খানিকক্ষণ ধরে দেখল অনিলিখা।

—কি কিছু পেলেন?

—বলছি। তার আগে বলো তোমার বাবা কি সুডোকু ভালোবাসতেন?

—বাবার এমনি ধাঁধার উপরে খুব ঝোঁক ছিল। তবে খুব একটা যে সুডোকু খেলত তা নয়। এখানে আসার পরে বরঞ্চ এ বইটা নিয়ে কয়েকবার বসে থাকতে দেখেছি।

—জিগ্যেস করছি কারণ এ বই-এর মধ্যে তোমার বাবা কিছু কিছু সংখ্যা লিখে মার্ক করেছেন। কিছু সংখ্যাকে আলাদা করে গোল দাগ দিয়েছেন। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, অনেক জায়গায় একটা ঘরের সঙ্গে পাশের ঘরের নাম্বার নিয়ে দুটি সংখ্যা ঘিরে দাগ দিয়েছেন। শুধু সুডোকু সলভ করার জন্য তো এটা কোনওভাবেই দরকার হতে পারে না। এটার পেছনে একটাই কারণ থাকতে পারে, তা হল ওনার 253 বা 361-এর মতো তিন অঙ্কের কিছু সংখ্যার দরকার হয়ে পড়েছিল। একটা কাগজ দাও তো। আমাকে একটা জায়গায় এই সংখ্যাগুলো আলাদা করে একটু লিখে রাখতে হবে।

সুচরিতা একটা অন্য ঘর থেকে কয়েকটা সাদা কাগজ নিয়ে এল। অনিলিখা গোল করা সংখ্যাগুলো একটা কাগজে পরপর সেখানে লিখে ফেলল। বেশ কিছু সংখ্যা। তবে কোনওটাই তিন অঙ্কের থেকে বড় নয়। সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনও সিকোয়েন্স নেই। র‍্যান্ডম নাম্বার। কিছু সংখ্যা আবার দুবার করে লেখা।

12, 23, 29, 11, 16, 46...253, 78, 91, 23...এরকম।

কিছুই বুঝতে পারল না অনিলিখা। খুব শক্ত সিকোয়েন্স হলেও চটজলদি তা ও বার করে ফেলত। কিন্তু না, এটা তা নয়। অন্য কিছু।

উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল অনিলিখা। পাশে একটা বুক কেস আছে। নানান ধরনের বই। বেশিরভাগ বাংলা বই। মাঝে দু-একটা ইংরেজি বই।

—এ বইগুলো তো এখানে আগেই ছিল, তোমরা এবার আনোনি, তাই তো?

—হ্যাঁ, আমরা এবারে তাড়াতাড়িতে কিছুই আনতে পারিনি। সময়ই পাইনি গুছিয়ে আনার। ওখানে আমাদের এত ভালো ভালো বই ছিল। সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। শুধু দু-একটা বই—যেগুলো বাবার খুব প্রিয়, সেগুলো বাবা আলাদা করে নিয়ে এসেছিল।

আলমারি ঠাসা প্রচুর বই। কিন্তু তার মধ্যে ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা খুব কম। গীতাঞ্জলির একটা ইংরেজি অনুবাদ বুককেসের তৃতীয় তাক থেকে উঁকি মারছে। ওটার দিকে দেখিয়ে অনিলিখা বলে উঠল—এটা কি এবারে এনেছিলেন? দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা পরে রাখা হয়েছে।

—হ্যাঁ, ওটা আসলে বাবার খুব প্রিয় বই। আমাকেও বারবার পড়তে বলত। ওই একটা বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

বইটা বার করে পাতা ওলটাল অনিলিখা। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ একেবারেই ভালো লাগে না অনিলিখার। সেই ভাষার মাধুর্য কোথায়? তবু প্রথম কবিতার দুটো লাইন পড়ল অনিলিখা।

Thou hast made me endless, such is thy pleasure,

This frail vessel thou emptiest again and again,

and fillest it ever with fresh life.

এটা কি সেই বাংলা কবিতার অনুবাদ?

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব। ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।'

ইংরেজি অনুবাদে কোথায় সেই শব্দের অনুরণন, কোথায় সেই ফিরে ফিরে আসা শব্দের সঙ্গে মনের কথা বলা। এ অনুবাদ একেবারেই পছন্দ নয় অনিলিখার।

বইয়ের পাতা উলটে বুককেসে রেখে ফিরে আসছিল। হঠাৎ আবার কী মনে হতে ফিরে গেল। আবার বইটা নিয়ে এল অনিলিখা। পাতা উলটে উলটে সুডোকুর থেকে পাওয়া সংখ্যাগুলোর পাশাপাশি এ বইটা দেখে কিছু ইংরেজি অক্ষর লিখে যেতে শুরু করল।

—কী দেখলেন অনিলিখাদি? কিছু সাহায্য করব?—পাশ থেকে উৎসুক হয়ে উঁকি মারল সুচরিতা।

—একটু সময় দাও, বলছি। আমি বইটায় কিছু জায়গায় পেনসিলে দাগ দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে নেই তো?—বলে সোফার উপরে পা তুলে বসল অনিলিখা। নিজের মনে বিভোর হয়ে কাগজে কিছু একটা লিখতে থাকল।

মিনিট পাঁচেক বাদে নীরবতা ভাঙল অনিলিখার। ততক্ষণে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কপালের উপরে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে নিয়ে চুলটা ক্লিপ দিয়ে আটকে বলে উঠল—যা ভেবেছিলাম। শুধু শুধু তোমাকে এই সুডোকুর বইটা দিয়ে যাননি। তিন লাইনের একটা ছোট মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন।

সেকী? কীভাবে?

—আমি শুরুতে গীতাঞ্জলী বইটা থেকে প্রত্যেক শব্দকে পরপর একটা আনুক্রমিক নাম্বার দিয়েছি—1, 2, 3, 4, 5, 6...এরকম। এবারে এই সুডোকুর বইতে ঠিক যে সংখ্যাগুলোতে গোল দাগ দেওয়া আছে, সেই সংখ্যা অনুযায়ী গীতাঞ্জলীর থেকে ওই সংখ্যা মিলিয়ে শব্দগুলো আলাদা করে নিয়েছি। এভাবে যে শব্দগুলো পেয়েছি, তার প্রথম অক্ষরগুলো পরপর লিখে ফেললে যা পাওয়া যায়, তাই হল এই মেসেজ।

—আরেকবার বলুন—সুচরিতা অবাক হয়ে বলে উঠল।

অনিলিখা ফের বলে উঠল—দাঁড়াও, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—ধরো সুডোকুর বইতে প্রথমে গোল করে হাইলাইট করা সংখ্যা হল 7। এবারে গীতাঞ্জলীর কবিতা যেখানে শুরু হয়েছে, তার সপ্তম শব্দ হল ‘Is’। আমি তার প্রথম অক্ষর ‘I’ শুধু নিয়েছি। সুডোকুর বই থেকে পাওয়া সংখ্যার সঙ্গে গীতাঞ্জলীর শব্দের ক্রমানুযায়ী একই সংখ্যার শব্দ মিলিয়ে যে শব্দগুলো এভাবে পেয়েছি, তার প্রথম অক্ষরগুলো পরপর সাজালে যা হয় তা হল—

I created new synthetic life. However, it fell into the wrong hands. Now the entire world is in danger from Dave.

অর্থাৎ—

আমি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছি। কিন্তু তা এখন খারাপ লোকের হাতে। যে-কোনও সময়ে পৃথিবী এখন বিপন্ন হতে পারে। ডেভের জন্য।'

—ডেভ?—উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সুচরিতা—এই তো মিলে গেল। অনিলিখাদি, এই ডেভের কথাই ইংল্যান্ড ছাড়ার মুহূর্তে বাবা আমাদের বলেছিল। কে এই ডেভ জানি না। এর জন্যেই আমরা ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতে চলে আসি। আমি নিশ্চিত এই লোকটাই বাবার মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত আছে।

—আচ্ছা। কে এই ডেভ জানতে হবে। শুধু তাই না, কীসের বিপদ তা-ও বুঝতে হবে। এমনকী বিপদ হতে পারে, যার জন্য সারা পৃথিবী বিপন্ন হতে পারে। নতুন সিন্থেটিক লাইফ? তার সঙ্গে উনি যুক্ত হলেন কীভাবে? সত্যিই খুব বড় কোনও চক্রান্ত হবে।

খানিকবাদে অনিলিখা বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। অপরাজিতবাবুর পরিবারের অনুরোধে পুলিশে খবর দেওয়া যাবে না। কিন্তু একইসঙ্গে অপরাজিতবাবুকে যে খুন করেছে, সে হয়তো এখনও কলকাতাতেই আছে। হয়তো অন্য কোনও বড় ষড়যন্ত্রের প্ল্যান করছে। অপরাজিতবাবুকে খুন করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? সেটা জানার একমাত্র উপায় হল উনি কী নিয়ে কাজ করছিলেন, কীসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা ভালোভাবে জানা। জাল টাকার কোনও চক্রের সঙ্গে কি সত্যিই কোনও যোগাযোগ ছিল ওনার? আর তাই তারা খুন করেছে অপরাজিতবাবুকে? কিন্তু উনি তো তা লিখে যাননি সংকেতে।

মুশকিল হল উনি বাড়িতে নিজের কাজের কথা কিছুই বলতেন না। আর তাই কেম্ব্রিজে পড়ানোর বাইরে উনি কী করতেন সেটা বাড়ির লোকেদেরও অজানা। একজনের কথাই সবার আগে মনে পড়ল অনিলিখার। মিস্টার পাই-এর। ওনার সঙ্গে সবার আগে যোগাযোগ করতে হবে।

৭

সন্ধে সাতটা। খানিকক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্ত হবে। নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোট-বড় নানান সাইজের বাহিনী অলসভাবে ঘোরাফেরা করছে। দূরে দিগন্তরেখার নীচে হারিয়ে যাওয়া সূর্য তার দিনান্তের শেষ আলো উদারভাবে তুলে দিয়েছে ওই মেঘ বাহিনীর হাতে। ঘর ফেরা পাখির ডাকে এখন চারদিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা অচেনা পাখি দূর থেকে চিক-চিক-চিক করে মাঝেমধ্যে বেশ জোরে জোরে ডেকে উঠছে। চারদিকে যতদূর দেখা যায়, শুধু সবুজ। সবুজের নানান শেড। পাম আর নারকোল গাছের সারি। তার মধ্যে বাতাসে ভেসে আসছে জলপ্রপাতের শব্দ। প্রকৃতির অসীম উদারতা যেন আগলে রেখেছে এই জায়গাকে।

আর কয়েকদিন বাদেই জিলের অবসর। গত তিরিশ বছর পোরটেরিকোতে কাটানোর পরে জিল অবসর নেবে। ফিরে যাবে ওর বাড়ি কলোরাডোয়। জিলের দুই ছেলে। একজন ক্যালিফোর্নিয়ায় কাজ করে, আর অন্যজন নিউ জারসিতে। বছরে কয়েক দিনের জন্য দেখা হয় ওদের সঙ্গে। স্বামী জন বহুদিন হল মারা গেছেন। তবে এসবের বাইরে জিলের যদি আরও আপনার কেউ থেকে থাকে, তা হল এই কাজ।

আর এই টেলিস্কোপ। অ্যারেকিবো টেলিস্কোপ। 1950 সালে এই টেলিস্কোপ প্রতিষ্ঠিত হয়। চারদিকের সবুজের মধ্যে স্টিলের বিশাল বৃত্তাকার টেলিস্কোপ। জিলের গত তিরিশ বছর কেটে গেছে অন্য গ্রহের প্রাণের সন্ধানে। কয়েক বছর আগে এই টেলিস্কোপে পাওয়া সঙ্কেত থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে মানুষ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একা নয়। অন্য গ্রহেও মানুষের মতো বা তার থেকে আরও অনেক বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।

আর একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। তাদেরই মধ্যে কেউ, তাদেরই কোনও বংশধর আজও আমাদের মধ্যেই আছে? আমরা হয়তো তাদের আলাদা করে চিনতে পারি না।

গায়ে কাঁটা দিল জিলের। সংকেত রহস্যের ঘটনা মনে পড়তে। সেবারে যাই হোক না কেন, সবার শেষে এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে জিলের সারা জীবন ব্যর্থ হয়নি। যে ঘটনার কেন্দ্রে ছিল অনিলিখা। সেই অনিলিখার সঙ্গে মাঝে দু-একবার সামান্য যোগাযোগ হয়েছে জিলের। কী এনার্জি আর সাহস ওই মেয়েটার। আর সব সময় মুখে কী মিষ্টি হাসি। কী সুন্দর উজ্জ্বল চোখ। এখনও যেন জিলের চোখে ভাসে।

সেই ঘটনার পরে এখনও রোজ মনে হয়, আবার বুঝি এল সেই সঙ্কেত। কিন্তু, না আর আসেনি। হয়তো তার প্রয়োজনও হয়নি ওদের দিক থেকে। আবার যখন প্রয়োজন হবে, ঠিক আসবে সেই সঙ্কেত।

অনিলিখার মতে ওদের সেই বংশধরেরা পৃথিবীতেই আছে। যারা এখনও ওদের পাঠানো সংকেতের ভাষা, সেই বৃত্তের ভাষা বুঝতে পারে। লুকিয়ে আছে পেরুর প্রত্যন্ত কোনও প্রান্তে। তাদের সঙ্গে নাকি সেই ভয়ানক অগ্নুৎপাতের রাতে ওর দেখাও হয়েছিল।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে শুধু তাদের কাছে অন্য গ্রহ থেকে পাঠানো সঙ্কেত যায়, তারা অন্য গ্রহের পাঠানো সে সঙ্কেত বুঝতেও পারে, অথচ সে সঙ্কেত পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী টেলিস্কোপগুলোতেও ধরা পড়ে না। সে সঙ্কেত টেলিস্কোপে তখনই ধরা দেয়, যখন সে সঙ্কেত পুরো মানবজাতির উদ্দেশ্যে হয়। ঠিক যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে সঙ্কেত রহস্যে।

এসব ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ ফোন কেঁপে উঠল। কল আসছে।

জিল অবাক হয়ে গেল নাম্বারটা দেখে। অ্যালিয়েনরা কি মন পড়তে পারে? কন্ট্রোল রুম থেকে স্বয়ংক্রিয় ফোন। আবার আসছে। এই ফোন এই নিয়ে গত তিরিশ বছরে মোটে সাতবার পেয়েছে জিল, যার মধ্যে

একবারই তা সঠিক ছিল।

অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার মহাকাশের কোনও জায়গা থেকে ন্যারো ব্যান্ড সিগনাল পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের আরেকটা টেলিস্কোপকে জানায়। ওই টেলিস্কোপ সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে দেখে আকাশের ওই দিক দিয়ে সত্যিই কোনও সঙ্কেত আসছে কিনা। দ্বিতীয় টেলিস্কোপেও একই সঙ্কেত গেলে কম্পিউটার অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের অভিমুখ সামান্য পরিবর্তন করতে বলে।

যদি অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য সিগনাল চলে যায়, আর আবার আগের পজিশনে মুখ ঘোরালে ফিরে আসে, তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, টেলিস্কোপ সত্যিই নির্দিষ্ট দিকের কোনও তারার কাছ থেকে সঙ্কেত পাচ্ছে। এর পরই কম্পিউটার এর কথা 'সেটি' বা 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স' টিমের গুরুত্বপূর্ণ সব বিজ্ঞানীদের জানায়।

জিল ঘরের পোশাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। কোনওরকমে পোশাক পরিবর্তন না করেই ছুট লাগাল কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে।

আজকে জিল ছুটিতে থাকলেও, এমনিতে কাজের দিন। তাই কন্ট্রোল সেন্টারে অনেকেই আছে। সবাই হুমড়ি খেয়ে স্ক্রিনে চোখ রেখেছে। মেসেজ আসছে। 1420 মেগা হার্জে। হাইড্রোজেন এই কম্পাঙ্কেই বিকিরণ করে। 1977 সালে 15 আগস্ট কর্নেল ইউনিভারসিটির দুই পদার্থবিদ মরিসন আর কোকোনি লিখেছিলেন যে যে-কোনও অ্যালিয়েন সভ্যতা এই কম্পাঙ্কেই সবার আগে সঙ্কেত পাঠাবে। এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক। মহাবিশ্বে সবথেকে বেশি রেডিয়েশন আসে হাইড্রোজেন থেকে আর তার কম্পাঙ্ক 1420 মেগা হার্জ।

ইতিমধ্যে কন্ট্রোল সেন্টারে নিস্তব্ধতাভঙ্গ হয়েছে। মনিটরে ফুটে উঠছে একটার পর একটা বৃত্ত। আর তার সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে উত্তেজনার পারা।

এরকম সঙ্কেত আগে আরেকবার দেখেছেন জিল। তবে সেবারে এ ভাষা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এখন আর তার নয়। এ ভাষা বৃত্তের জটিল ভাষা। এ ভাষা বুঝতে যদিও আজও সময় লাগে। তবে কি আবার বড় কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে পৃথিবীতে? তা না-হলে হঠাৎ করে ওরা আবার এই সঙ্কেত পাঠাবে কেন?

৮

কলকাতা পুলিশের ফরেনসিক এক্সপার্ট রাজর্ষি সরকারের উপরে এবারে এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা যে সাধারণ পুলিশের কর্ম নয়, তা পরিষ্কার। এই নিয়ে সাত-সাতটা রহস্যজনক মৃত্যু। আর প্রত্যেকটাতেই পাওয়া গেছে শুধু কঙ্কাল। আরেকটা জিনিসও প্রত্যেকটা জায়গায় পাওয়া গেছে: তা হল একটা কাগজে লেখা টাইপ করা সংখ্যা 666। অবশ্য এটার কথা মিডিয়াকে জানানো হয়নি। অহেতুক কাজে আরও অনেক বেশি অসুবিধে হত।

সপ্তম হত্যাটা আজকেই হয়েছে। ভোরবেলা খবর আসে যে আরেকটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেনে। কার সেটা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সন্দেহ করা হচ্ছে, এটা বিখ্যাত লেখক রূপম বসুর। ওনার বয়স পয়ষট্টির মতো হয়েছিল। থাকতেন শিবপুরেই। নিজের বাড়িতে।

কালকে রাতে উনি বাড়ি ফেরেননি। অনেক সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে রাত দশটা নাগাদ ফিরতেন। তাই রাত এগারোটা অবধি কেউ চিন্তা করেনি। তার পরেও না ফিরে আসায় সব জায়গায় খোঁজাখুজি শুরু হয়। ওনার সব বন্ধুর বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া শুরু হয়। উনি সেখানে যাননি। ভোর হতেই পুলিশে জানানো হয়। আর তার কয়েক ঘণ্টা বাদেই এই কঙ্কাল পাওয়া যায় বটানিকাল গার্ডেনে।

উনি কালকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যা পোশাক পরেছিলেন, তার সঙ্গে যে পোশাক পরা অবস্থায় কঙ্কাল পাওয়া যায়, তার বর্ণনা একদম মিলে গেছে। একটা পুকুর ধারে গাছের পাশে এই কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেছে রাজর্ষির কাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসেছে রাজর্ষি।

গাড়ি নিয়ে যতটা সম্ভব কাছাকাছি এসে, গাড়ি দাঁড় করিয়ে দ্রুত পায়ে ইন্সপেকটর লাহিড়ি আর ফরেনসিক টিম নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে গেল রাজর্ষি। যা ভয় ছিল, তাই হয়েছে। চারদিকে কৌতূহলী লোকের ভিড়। ফরেনসিকের মূল কথাই হল ক্রাইম সিনকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও অপরিবর্তিত রাখতে হবে, যাতে কোনও এভিডেন্স নষ্ট না হয়। অনেক লোক ওই জায়গায় গিয়ে থাকলে অপরাধীকে শনাক্ত করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। প্রমাণ পাওয়া গেলেও সেটাই যে আসল অপরাধীর, সেটা আদালতে প্রমাণ করা সহজ হয় না। যাই হোক, এখন আর কিছুই করার নেই। তবু প্রথমেই রাজর্ষির টিম টেপ দিয়ে পুরো জায়গাটা আলাদা করে দিল।

গাছের পাশে কঙ্কালটা চিত হয়ে পড়ে আছে। শুধু কঙ্কালের মাথা আর হাফ হাতা শার্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা হাতের হাড় দেখা যাচ্ছে। হাতে গ্লাভস পরে জায়গাটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল রাজর্ষি।

রাজর্ষি নিজে ফরেনসিক এন্টোমোলজিস্ট। যে-কোনও মৃত্যুর পরে মৃতদেহে নানান ধরনের পোকা ও মাছি জড়ো হয়। তারা শরীরে বাসা বাধে, ডিম পাড়ে। সেই লার্ভার লাইফ সাইকেল থেকে মৃত্যুর সময় বোঝা যায়। ওর সঙ্গে অন্য এক্সপার্টরাও থাকে, যাদের প্রত্যেকের সাহায্য এ ধরনের তদন্তে লাগে।

সকালে কঙ্কালটা এভাবে পড়ে থাকতে প্রথম দেখে এই বাগানেরই এক কর্মচারী। সন্ধে ছ'টায় বটানিকাল গার্ডেন বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে সব লোককে বার করে দেওয়া হয়। মোটামুটি দেখে নেওয়া হয় আর কেউ ভেতরে আছে কিনা। কিন্তু পুকুরধারে গাছের আড়ালে এরকম একটা জায়গা কারুর চোখে না পড়তেই পারে।

সকাল 5টায় এখান দিয়ে যাওয়ার সময় ওই মালির চোখে পড়ে। মনে হয় গাছের ফাঁক দিয়ে কী একটা যেন বেরিয়ে আছে। তখনও বাগান খোলেনি। তাই এগিয়ে এসে কে ওখানে দেখতে গিয়ে কঙ্কালটা খুঁজে পায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। আজ ভোর রাতেই থানায় রূপমবাবুর সম্বন্ধে মিসিং পার্সেন ডায়েরি করা হয়েছে। তাই মৃতদেহ কার তা পোশাকের বর্ণনা থেকে বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। ওনার বাড়িতে খানিক আগেই জানানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির লোক এসে যাবে।

বাগানের লোকটাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করে তেমন কিছু নতুন তথ্য পেল না রাজর্ষি। রাজর্ষির সঙ্গে সবসময় একটা নোট নেওয়ার খাতা থাকে। ও সব ডিটেলস লিখে নিল। ফিঙ্গার প্রিন্ট, আশেপাশে পড়ে থাকা যাবতীয় ছোটখাটো জিনিস আলাদা আলাদা করে প্লাসটিকের ব্যাগে ভরে নিল ওর টিম।

অনেক কিছুই হয়তো এখানে ঘটনার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তবু এখানে পড়ে থাকা একটা ফাইবারও অপরাধীকে খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে।

গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিড়। কিছু কিছু জায়গায় মাটির উপরে পায়ের দাগ। যত্ন করে পুরো জায়গাটার ছবি তুলে নিল রাজর্ষি।

কঙ্কালের হাতের পাশে একটা ছোট বাক্স। তাতে কাগজে লেখা সেই একই সংখ্যা 666।

প্রত্যেকবার খুনি এটা লিখে রেখে কী প্রমাণ করতে চায়? এটাই কি খুনির সিগনেচার? এর থেকেই প্রথম সন্দেহ শুরু হয় যে এর মধ্যে বড় একটা রহস্য আছে, এগুলো স্বাভাবিক খুনির কাজ নয়।

এ রহস্যের সমাধানের জন্য ট্রেস এভিডেন্সই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ট্রেস এভিডেন্স বলতে বোঝায় আশেপাশে পড়ে থাকা চুলের টুকরো, কোনও ফেব্রিক, ধুলো, সিগারেটের টুকরো—এরকম সব আর কি। কঙ্কালের চারদিকে তেমন কোনও পোকা, মাছি জড়ো হয়নি। যা এটাই প্রমাণ করে যে স্বাভাবিক কোনও ডিকম্পোজিশন বা পচন হয়নি শরীরের।

পাশে একটা বই পড়ে আছে। সেটা যত্ন করে তুলে নিল রাজর্ষি। বাংলা বই। 'রহস্য যখন শিবপুরে'। মনে হয় রূপমবাবু এটাই পড়ছিলেন। এর মধ্যেও হাসি পেল। বইটারই একটা চরিত্র হয়ে গেছেন রূপমবাবু নিজে।

৯

না, কিছুই মাথায় ঢুকছে না রাজর্ষি সরকারের। এতদিন ভালো কাজ করে যেটুকু সুনাম হয়েছিল, পুরোটাই প্রায় খোয়াতে চলেছে এই কেসে। এমনকী দপ্তরের যারা রাজর্ষিকে সমীহ করে চলত, যারা ভাবত ওর মতো দক্ষ ইনস্পেকটর ও ফরেনসিক এক্সপার্ট কলকাতা পুলিশে দুর্লভ, তাদের মধ্যেও কানাঘুসো চলছে—এটাই বুঝি রাজর্ষি স্যারের কেরিয়ারের শেষ।

একমাত্র মিষ্টি খেলেই মন খারাপ খানিকক্ষণের জন্য কাটে। সকাল থেকে তাই প্রায় ছ'টা রসগোল্লা খাওয়া হয়ে গেছে। টিফিন বক্সের থেকে আরেকটা রসগোল্লা নিয়ে মুখে ফেলল রাজর্ষি।

অষ্টম খুনটাও কালকে হয়ে গেছে। এবারে খুন বছর চল্লিশেকের একজন দক্ষিণ ভারতীয়। নাম ভেঙ্কট গণেশান। ব্যবসায়ী। বেশ বড় একটা দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট চেনের মালিক। গতকাল রাতে একটা ক্লাবে পার্টি ছিল। পার্টির পরে বাড়ি না ফিরে ক্লাবেরই একটা ঘরে ছিলেন ভেঙ্কট। দুপুর দুটো অবধি ভেঙ্কটের সাড়া না পাওয়ায়, আর বাড়ি থেকে দুবার ফোন আসার পরে, ক্লাব কর্ত,পক্ষের টনক নড়ে। তার পরে দরজা খুলে দেখা যায় এই কাণ্ড। ঘরের সোফার উপরে ভেঙ্কটের কঙ্কাল। রাত দশটার পরেও একাধিক লোক ভেঙ্কটের সঙ্গে হোটেলের ঘরে দেখা করতে এসেছে। পুলিশ ক্লাবের রেজিস্টার থেকে এই সময়ের পরে যারা যারা এসেছিল, ক্লাবে ঢুকেছে, তাদের সবার নাম-ঠিকানা জোগাড় করে তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এখন অবধি কোনও আশার আলোই পাওয়া যায়নি।

আর হ্যাঁ, ওই একই কাগজ পাওয়া গেছে. যাতে লেখা সেই একই সংখ্যা 666।

পরপর নাম, বয়স, পেশা, খুনের জায়গা সব সাজিয়েও কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পেল না রাজর্ষি। মোডাস অপারেন্ডি থেকেও খুনির সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণা করা যাচ্ছে না।

উদ্দেশ্যটা কী? যারা খুন হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন পেশা। ভিন্ন জায়গার বাসিন্দা। কোনও সূত্রেই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও যোগসূত্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। ডিজিটাল ক্যামেরায় ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবিগুলো ফের এক এক করে ল্যাপটপে দেখতে শুরু করল রাজর্ষি। যদি আরও কোনও কিছু চোখে পড়ে। খুব টেনশনে পড়লে রাজর্ষি সমানে পা নাচায়। আজকে ওর সেটাই হচ্ছে।

ঠিক এরকম সময় বেয়ারা এসে জানাল, একজন মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বাইরে অপেক্ষা করছে।

যতসব উটকো ঝামেলা। নির্ঘাত আবার কোনও সাংবাদিক হবে। আবার একশোটা অর্থহীন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করে যাবে। বিরক্ত হয়ে 'না' বলে দিচ্ছিল রাজর্ষি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী ভেবে বেয়ারার হাত থেকে মহিলার পাঠানো ভিজিটিং কার্ডটা চেয়ে নিল। আর তার পরে সেটা দেখেই বলে উঠল—ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

খানিকবাদে যে ঘরে ঢুকল, তার স্বাভাবিক স্মার্টনেস, উজ্জ্বল চোখ ও আকর্ষণীয় চেহারায় মুগ্ধ না হয়ে কোনও উপায় নেই। জিন্সের উপরে লাল হাফ হাতা টপ। লাল লিপস্টিক। কাঁধ অবধি খোলা চুল। চেহারায় সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত সম্ভ্রান্তির ছাপ, যেটা আজকাল চট করে চোখে পড়ে না।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উলটো দিকেই বসার চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বলে উঠল রাজর্ষি—আপনিই অনিলিখা? আপনার কথা অনেক শুনেছি। এমনকী আপনার আগের বেশ কয়েকটা অভিযানের কথা

মিডিয়াতে অত ভালো করে না বেরোলেও খবর পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল আপনি, মানে—

—আরেকটু বয়স্ক হব ভেবেছিলেন, তাই তো?—হেসে বলে উঠল অনিলিখা—আসলে আমার ভাগ্যেই সব ঘটনা ঘটে। আমি এই সিরিয়াল হত্যার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

—হ্যাঁ, কালকে আমাদের বড়সাহেবের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম, যে আপনি আমার সঙ্গে এ-কেসটার ব্যাপারে দেখা করতে চান। সত্যি কথা বলতে কী আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম, কারণ এ ধরনের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে আপনার কি আগ্রহ থাকতে পারে বুঝিনি। এ-বার এ কেসের কথায় আসি। আমি এখনও কোনও আশার আলো দেখিনি। কাউকে সন্দেহ করারও খুঁজে পাইনি। তাই যে-কোনও ধরনের তথ্য আমাকে যদি কোনও পথ দেখায়, তার জন্য মন খোলা রেখেছি। তা আপনি কি এই ভিকটিমদের মধ্যে কাউকে চিনতেন?

—না, এদের কেউই আমার পরিচিত নন।

—তবে? আপনার কাছে কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে?

—হ্যাঁ, একটা জিনিস সন্দেহ করছি। তবে তা বলার আগে যদি এ ব্যাপারে কিছু জানান, আমার আন্দাজ করতে সুবিধে হবে। আপনি কি এখনও অবধি এ ঘটনাগুলোর পিছনে নিজে কোনও ব্যাখ্যা পেয়েছেন? মানে খুনটা ঠিক কীভাবে হচ্ছে? আমার মূল আগ্রহ হল এই খুনের পদ্ধতিতে। এরকম কথা তো কেউ আগে কখনও শোনেনি, যে খুনের পরে শুধুই কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে।

—দেখুন, আমাকে বলা হয়েছে, আপনার সঙ্গে তথ্য শেয়ার করতে কোনও অসুবিধে নেই, তাই বলছি। যে ক'টা খুন বাড়ির মধ্যে হয়েছে, সেখানে খুনের পরেই ছোট কাগজে টাইপ করা একটা লেখা পাওয়া গেছে। তাতে ইংরেজিতে একটা সংক্ষিপ্ত সেনটেন্স—'Your Unknown Past' বা 'তোমার অজানা অতীত' আর তার নীচে লেখা একটা সংখ্যা—666।

আমরা এ ব্যাপারে কাউকে জানাইনি। কোনও কাগজেও প্রকাশ হয়নি। তবে এটাই একটা বড় সূত্র। 666-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা খুনের পরে খুনি নিজের সাক্ষর রেখে গেছে। তবে তার আগের ওই লেখাটার অর্থ ঠিক কী হতে পারে, এক্ষেত্রে তা এখনও বুঝতে পারিনি।

কী যেন এক মুহূর্ত ভাবল অনিলিখা। তার পরে বলে উঠল—বলে ভালো করলেন। প্রথমে 666-এর প্রসঙ্গে আসি। প্রথমত যে এ ঘটনার পেছনে যুক্ত আছে, সে অঙ্ক ভালো বোঝে। কারণ 666 একটা খুব ইন্টারেস্টিং সংখ্যা। 1 থেকে 36—প্রথম 36টা ন্যাচারাল নাম্বার বা অখণ্ড সংখ্যা যোগ করলে 666 হয়। এ ছাড়া এটা 1, 3, 6, 10, 15-এর মতো একটা ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার।

—সেটা আবার কী?—ইতিমধ্যেই রাজর্ষি বুঝতে পেরেছে যে সামনের এই মহিলা ঠিক এই সংখ্যাটার মতোই ইন্টারেস্টিং।

—যে কয়েকটা ডট দিয়ে একটা ত্রিভুজের গঠন তৈরি করা যায়, সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলি ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার। আপনি একটা ত্রিভুজের গঠন আর ক'টা ডট দিয়ে সে ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব ভাবলেই এটা খেয়াল করবেন। যেমন 3টে ডট দিয়ে একটা ত্রিভুজের শেপ আনা সম্ভব, 6টা ডট দিয়ে আনা সম্ভব। ঠিক তেমনই 666 এই সংখ্যক বিন্দুর মাধ্যমেও একটা ত্রিভুজ বানানো সম্ভব। তাই এই সংখ্যা হল একটা বিশেষ সংখ্যা। ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার। তবে এখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে, অপরাধী যে অঙ্কে ও সঙ্কেতে আগ্রহী এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অপরাধীর প্রোফাইল ভাবার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ ছাড়া এর একটা ধর্মীয় অনুসঙ্গ আছে।

666 হল নিউ টেস্টামেন্টের মতে 'নাম্বার অফ দ্য বিস্ট'। অর্থাৎ 'শয়তানের সংখ্যা'। যে এর পেছনে কাজ করছে, সে ক্রিশ্চান হতে পারে, তবে একইসঙ্গে সে জানাতে চায় যে সে খুব খারাপ কোনও কাজ করতে চলেছে। তবে এসবই অবশ্য অনুমান।

মুগ্ধ হয়ে রাজর্ষি বলে ওঠে—একটু চা খাবেন? বা রসগোল্লা?

—না, না। শুধু চা।

বেয়ারা ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে রাজর্ষি ফের বলে ওঠে—আর এর বাইরে যে লেখাটার কথা বললাম সেটা নিয়ে কিছু মনে হয়?

—'তোমার অজানা অতীত'—এই লেখাটা নিয়ে বলছেন তো?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা একটা খুব বড় ক্লু। এর একটাই অর্থ খুনি এদের প্রত্যেককে চেনে। আর ব্ল্যাকমেল করতে চায়। কিন্তু যারা যারা খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। খুনি কীভাবে এদের সবাইকে চেনে তাই বোঝা যাচ্ছে না। সেখানেই হিসেব মিলছে না।

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে যেন কিছু ভাবল অনিলিখা। তার পরে বলে উঠল—আচ্ছা, যদি এই লেখাটা আপনি নিজে পেতেন কী করতেন?

—মানে? আমি পাব কেন? আমার আবার সেরকম কিছু অজানা অতীত আছে নাকি?—রাজর্ষির গলায় একটু বিরক্তির সুর।

আসলে ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, কিছুদিন আগে একটা গাড়ির পিছনে তাড়া করতে গিয়ে একটা লোককে চাপা দিয়ে প্রায় মারতে বসেছিল। অনেক কষ্টে কেসটাকে চাপা দেওয়া হয়।

রাজর্ষির দিকে খানিকক্ষণ গভীর ভাবে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল অনিলিখা—আমাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু কথা থাকে, যা আমরা অন্য কাউকে জানতে দিতে চাই না।

—কিন্তু হঠাৎ করে একথা?

—এই চিঠিটা পেয়ে সবার আগে চিঠির প্রাপকের যে প্রতিক্রিয়া হবে তা হল, অন্য ঘরে গিয়ে এর সঙ্গের জিনিসটাকে দেখা। তাই না? আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে সবার সামনে এটা খোলা হোক।

—হুঁ, তা হতে পারে। ইন্টারেস্টিং চিন্তা।

—আর তাই এটা খোলার পরে কী হয়েছে, সেটা কেউ জানতে পারেনি। তা এর সঙ্গে আর কী পাওয়া গেছে জানতে পারি কি?

মেয়েটাকে এতটা বলা ঠিক হচ্ছে কি? একটু দ্বিধা নিয়ে রাজর্ষি ফের বলে ওঠে—একটা ছোট প্লাস্টিকের বাক্স। দেখাচ্ছি,—বলে একটা ছোট দেশলাই বাক্সের সাইজের প্লাস্টিকের বাক্স নিয়ে এল। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অনিলিখা নেড়েচেড়ে দেখল। বাক্সটার গায়ে একটা ছোট সুইচের মতো আছে। প্রেস করলে ঢাকাটা খোলে। বেশ কয়েকবার খোলা-বন্ধ করে দেখল।—আচ্ছা, এর ঢাকার ভেতর দিকে কিছু লাগানো ছিল কি?

—ঠিকই ধরেছেন। এর ঢাকা যেভাবে স্প্রিং-এর মতো খুলছে, তাতে মনে হয় এর সঙ্গে এমন কিছু লাগিয়ে রাখা যায় যা আঙুলে এসে বিঁধতে পারে। তবে বুঝতেই পারছেন, যেখানে বডি পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে কারণটা ঠিক বলা যাবে না।—একটু থেমে ফের বলতে থাকে রাজর্ষি—আপনিও নিশ্চয়ই বুঝেছেন, সব থেকে বড় রহস্য খুনের পরে এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহ কীভাবে কঙ্কালে পরিণত হল। শরীরের পচন, খোলা বাতাসে তাড়াতাড়ি হলেও এভাবে কঙ্কাল হতে বেশ কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস লেগে যাওয়ার কথা। সেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

পচনজনিত কোনওরকম দুর্গন্ধ, পোকা বা মাছির জড়ো হওয়া—এরকম কিছুও ঘটেনি। বিশেষ করে ধরুন রূপমবাবুর খুন। খুন যদি বোটানিকাল গার্ডেনেই হয়ে থাকে, তাহলে মৃতদেহ সারারাত বাইরে পড়ে থাকার কথা। সেখানে যে ধরনের পোকা-মাছি মৃতদেহকে ঘিরে জড়ো হয়, এক্ষেত্রে তার কিছুই হয়নি। এখনও বুঝতে পারছি না কী করে হচ্ছে এসব।

—তা আপনি সন্দেহজনক কিছু পেয়েছেন ফরেনসিকসে?

—হ্যাঁ, তা পেয়েছি। রূপমবাবুর খুন যেখানে হয়, সেখানে একটা বিদেশি কোম্পানির মোজার ফাইবার পেয়েছি। মনে হয় অপরাধী জুতো খুলে শুধু মোজা পরে এগিয়ে গিয়েছিল রূপমবাবুর দিকে। রূপমবাবুর

কেসটা না-হয় বাদ দিলাম, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছে বাড়ির মধ্যে, তখন বাইরের কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও কী করে খুনি প্রত্যেকবার তার শিকারের কাছে পৌঁছচ্ছে, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন।

—আচ্ছা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কি কোনও অচেনা লোক গিফট জাতীয় কিছু দিতে এসেছিল?

—প্রত্যেক ক্ষেত্রে পাওয়া এই বাক্সের থেকে ভাবছেন? হ্যাঁ। যারা খুন হয়েছে, তারা একটা গিফট প্যাক পেয়েছিল, যার মধ্যে ওই লেখাটা আর ওই বাক্সটা ছিল। আমার ধারণা কোনও ধরনের ব্ল্যাক মেলিং-এর মূলে।

—এরকম হতে পারে এই গিফট প্যাক পেয়ে এরা তা খুলেছে। প্রথমেই পেয়েছে ওই লেখাটা। লেখাটা পেয়ে আলাদা ঘরে চলে গেছে। সেখানে বাকি অংশ খুলে দেখেছে।

—হতে পারে। কে ওই গিফট প্যাক দিতে এসেছিল, আমরা সেই লোকটার খোঁজ করছি। এটা তো যাকে ইচ্ছে দিয়ে পাঠানো যেতে পারে। মুশকিল হল আমরা এর পরের খুনটাকে আটকাব কী করে? কে এর পিছনে কাজ করছে?

আরও সামান্য কিছু কথার পরে অনিলিখা বেরিয়ে এল। কথা হল, নতুন কিছু জানতে পারলে রাজর্ষি অনিলিখাকে জানাবে।

১০

সন্ধের সময় এই সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে আসতে খুব ভালো লাগে এণাক্ষীর। তাই মাঝে মাঝেই অফিস ফেরত এখানে চলে আসে। চার্চের পরিবেশ খুব ভালো লাগে। সারি দেওয়া কাঠের বেঞ্চিগুলোর যে-কোনও একটাতে বসে থাকে কিছুক্ষণ। উপরের দেওয়ালের নকশা, রঙিন কাচের বিশাল বিশাল জানলাগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে। আজকেও খানিকক্ষণ কাটিয়ে চার্চ থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন বাইরে বিশেষ লোক নেই। খানিকটা হেঁটে রবীন্দ্রসদন মেট্রোয় যেতে হবে। বাড়িতে গিয়ে আবার রান্না করতে হবে মনে হতেই জ্বর এল। কাজের লোক ছুটিতে গেছে। হঠাৎ ও খেয়াল করল এক বিদেশি ভদ্রলোক হাতে একটা ম্যাপ নিয়ে ঘুরছেন। এনাকেই যেন আজকে অফিসে দেখেছিল এণাক্ষী। কী একটা কারণে এসেছিলেন যেন। ঠিক মনে পড়ল না।

এণাক্ষীকে দেখে এগিয়ে এলেন।

ইংরেজিতে বলে উঠলেন—এটাই কি সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল?

হ্যাঁ, কিন্তু আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক যেন একটু দুঃখ পেলেন।

বলে উঠলেন তাহলে তো আবার কালকে আসতে হবে। এত দূর থেকে এলাম। ঠিক এরকমই একটা ক্যাথেড্রাল আমাদের লন্ডনেও আছে। কেন্সিংটনের কাছে। একই আর্কিটেক্টের হাতে তৈরি।—একটু থেমে একটা কাগজ এণাক্ষীর হাতে দিয়ে ফের বলে উঠলেন—আচ্ছা, এটা কোথায় জানো? আমাকে এবার এখানে যেতে হবে।

কাগজটা নিয়ে একটু অবাক হল এণাক্ষী। কারণ তাতে কোনও ঠিকানা লেখা নেই। কী একটা কথা লেখা আছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একটু সরে একটা ল্যাম্পের আলোর কাছে এসে দেখল, তাতে শুধু একটা সংখ্যা লেখা আছে। 666।

আর কী একটা লেখা। Your Unknown Past.

ও অবাক হয়ে মুখ তুলে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। দেখল বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে হাসি। মুখের ভাবটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

১১

—অনিলিখা?—কণ্ঠস্বরটা একবার শুনেই অনিলিখার বুঝতে অসুবিধে হল না, উলটো দিকে কে আছেন।

—হ্যাঁ, বলছি। কেমন আছেন জিল?

—হ্যাঁ, ভালো আছি। তা আমি তো বহুদিন বাদে ফোন করলাম। একবার গলা শুনে চিনে গেলে? তোমার মধ্যে ভিনগ্রহী প্রাণীদের অনেক ধর্ম আছে দেখছি।—হেসে উঠল দুজনেই।

জিল ফের বলতে শুরু করলেন—সরাসরি আসল কথায় চলে আসি। এত দিন বাদে আবার সেই গ্রহ থেকে সঙ্কেত পেয়েছি। HD 214 825 OAB থেকে।

—আট বছর বাদে আবার সেই সঙ্কেত?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এর মাঝে আমরা আর কোনও সঙ্কেত পাইনি। আমরা এখনও এবারের সঙ্কেতটা উদ্ধার করতে পারিনি। আমাদের এক্সপার্টরা সঙ্কেত উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। সেই একইরকম বৃত্তের সঙ্কেত। জটিল সঙ্কেত। তবে প্যাটার্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে একই জায়গা থেকে এসেছে। একটা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে তার পাশের বৃত্তগুলোর উপরে চাপ আঁকলে তাদের মধ্যে যে কোণ থাকে, তার উপরেই নির্ভর করে এই সমীকরণ। কিন্তু মূল সমস্যা হল হাজারো বৃত্তের ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করতে হবে তা জানা নেই।

আমরা এখনও জানি না, কীভাবে সেটা তাড়াতাড়ি বার করা যাবে। তবে এটুকু নিশ্চিত যে ঠিক আগের বারের মতো আবার কোনও বড় বিপদ হতে চলেছে। তা-না হলে ওরা এ সঙ্কেত পাঠাত না।

—আচ্ছা, ডক্টর গিলের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই না?

—না, উনি তো নিশ্চিত মারাই গিয়েছিলেন। এই ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির হাত থেকে বেঁচে পালানো তো আর অত সহজ ছিল না। ঠিক যেমন ওর প্রযুক্তিতে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলো মারা গিয়েছিল, ওরও একই দশা হয়েছিল মনে হয়।

—হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে।—চুপ করল অনিলিখা।

উলটো দিক থেকে জিল আবার বলে উঠলেন—আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। আগের বারে তোমার জন্যই আমরা এত বড় রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলাম। এবারের ঘটনা কোন দিকে এগোচ্ছে, তোমাকে জানাব। তোমার সাহায্য এবারেও লাগতে পারে।

আরও মিনিট পাঁচেক কথা হল। অনেক সময় স্মৃতি যেন পাথরের উপরে খোদাই করে লেখার মতো হয়। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সে ঘটনার ছবি। এখনও মনে পড়ে আমাজনের জঙ্গলে কাটানো সেই রাত। বাতাসে মিশে থাকা সেই তীব্র সালফার ডাই-অক্সাইড-এর গন্ধ। সেই রাতের অন্ধকারে আমাজনের জলে সাঁতরানোর অভিজ্ঞতা। সেই রহস্যময় উপজাতির কথা, যাদের সাহায্যে টটোরা নৌকোয় পালাতে পেরেছিল অনিলিখা। আর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গায়ে সেই রক্তের রং ছড়িয়ে পড়া। আর তার পরে সে রং ছড়িয়ে পড়েছিল আরও দূরে দূরে, সারা আকাশে। এই আগুন লাগা রং আর কখনও দেখেনি অনিলিখা। এখনও যেন চোখে ভেসে ওঠে। যেন সবই কালকের ঘটনা।

আবার ফোন বাজছে। ফোনটা তুলে নিল। উলটো দিকে রাজর্ষি সরকারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

—অনিলিখা, এই পাঁচ মিনিট আগে নবম খুনটার খবর পেলাম। এবারে যিনি মারা গেছেন, তার নাম এণাক্ষী মিত্র। সরকারি চাকুরে। আয়কর দপ্তরে কাজ করতেন। কালকে সন্ধে থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এইমাত্র কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালের কাছে। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি. আপনি কি একবার জায়গাটা নিজে দেখতে চান?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিলিখা। ফের বলে উঠল—

আচ্ছা, যারা যারা খুন হলেন তাদের নামগুলো একবার বলতে পারবেন?

—হ্যাঁ, এ ক'দিন তো রাতে স্বপ্ন দেখলেও ওই এক কেস নিয়েই দেখছি। সব নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল মুখার্জি, লিলি বসু, লিসা থমাস, হিরন্ময় শুর, রূপম বসু, অজয় মণ্ডল, ভেঙ্কট গণেশান, এণাক্ষী মিত্র। দেখেছেন সবক'টা নাম একবারে কীভাবে পরপর বলে দিলাম।

—আচ্ছা, পরপর ঠিকভাবে বলেছেন তো? আগে রূপম বসু না অজয় মণ্ডল। ওখানে হিসেব মিলল না।

—ঠিক ধরেছেন। ওটা ভুল হয়ে গেছে। আগে অজয় মণ্ডল খুন, তার পরে রূপম। কেন বলুন তো?

—সর্বনাশ। জানি না এটা কী করে সম্ভব। তবে একজন পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব। শুধু শুধু এর জন্য এতগুলো খুন।

—কী বলছেন বলুন তো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—যে ক'জন খুন হলেন, তাদের সব ক'জনের নামের প্রথম অক্ষরগুলো পরপর রাখলে হয় 'Gill Harve' 'গিল হার্ভে'।

—তা সে কে?

—সঙ্কেত রহস্যের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। ওখানে 'গিল হার্ভে'-র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উনিই ছিলেন সেবারের পুরো কর্মকাণ্ডের পেছনে। 'মনু রিজার্ভ ফরেস্ট'-এ সেবারে উনি ওনার গবেষণার মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন প্রাণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। অনেকটা সফলও হন। উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। তার খুব খারাপ ফলাফল হতে পারত। সেবারে ওনার চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু আমাদের ধারণা হয়তো ভুল ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে উনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু জানি না, এখন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কাকতালীয় ভাবেও যোগাযোগ হতে পারে। তবে 5 শতাংশ চান্সও যদি থাকে, আমাদের সতর্ক হতে হবে। একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাইলে, তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

একটু থেমে রাজর্ষি বলে উঠল—যাই হোক। আমাকে এবারে ঘটনাস্থলে যেতে হবে। সময় নেই। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি যেতে চান?

—না, আমার যাওয়ার দরকার নেই। তবে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে অবশ্যই জানাবেন।

১২

পুলিশের ফাইলে খুব কম তথ্যই আছে সংকেত রহস্যের ঘটনার উপরে। রাজর্ষি শুনেছিল যে খবরটা যাতে সবার সামনে না আসে, তার জন্য অনেক গোপনীয়তা নেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে ক্লাসিফায়েড টপ সিক্রেট ইনফরমেশন। তা ছাড়া ঘটনাটা ঘটেছিল ভারতের বাইরে। আমেরিকাতে, আয়ারল্যান্ডে, পেরুতে। বেশ কয়েকটা ফোন, ফাইল-পত্র দেখার পরেও তেমন কোনও ইনফরমেশন না পেয়ে ও বাধ্য হল অনিলিখাকে ফোন করতে।

—অনিলিখা, আমি রাজর্ষি বলছি। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু 'সংকেত রহস্য'-এর সম্বন্ধে জানাবেন। ঠিক কী হয়েছিল। আসলে জানেনই তো আসলে কী হয়েছিল সে তথ্য এতটাই গোপনীয়তার সঙ্গে রাখা হয়েছে যে আমার পক্ষে গিল হারভের সম্বন্ধে কিছু জানা শক্ত হয়ে পড়ছে। আপনিই বা কীভাবে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন?

—আসলে এ ব্যাপারে আমার পক্ষেও সব কিছু বুঝিয়ে বলা বেশ শক্ত। বেশ কিছু তথ্য টপ সিক্রেট। তাই গিল হারভে সম্বন্ধেই মূলত বলব, যাতে খুঁজে বার করতে সহজ হয় আপনার পক্ষে।

—কিন্তু তার আগে বলুন তো রহস্যটা শুরু হল কীভাবে? —রাজর্ষি নাছোড়বান্দা।

—আচ্ছা একটু আগে থেকেই বলছি। আয়ারল্যান্ডের শস্যখেতে হঠাৎ এক ছোটবড় বৃত্তের জটিল নকশা দেখা যায়। ক্রপ সারকেলের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, যা কীভাবে রাতারাতি তৈরি হয় তা নিয়ে এখনও অনেক বিতর্ক আছে। এটা না হয় সেরকমই আরেকটা ক্রপ সারকেল বলে ভেবে নেওয়া যেত। কিন্তু এখানে সমস্যা হল অন্য জায়গায়। ওই একই ধরনের জটিল নকশা দেখা গেল আমেরিকার এক সদ্য আবিষ্কৃত গুহার দেওয়ালে। সেটা ওই দেওয়ালে আঁকা হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগে। কী করে দুটো এরকম নকশার মধ্যে এইরকম আশ্চর্য মিল সম্ভব, একটা সদ্যপ্রাপ্ত, অন্যটা পঞ্চাশ হাজারের বছরের থেকেও পুরোনো যা আগে কারুর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। পরে জানতে পারি যে ওই একই সংকেত, একই রকম নকশা এসে পৌঁছেছে সেটি-র কাছে পোরটেরিকোর অ্যারেকিবো টেলিস্কোপে। এর মধ্যে হঠাৎ করে পেরুর কিছু উপজাতির সংখ্যা দ্রুত কমতে শুরু করে। তারা হাজার হাজার বছর ধরে ওখানে থেকেছে। তাদের জীবনধারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। হঠাৎ করে তাদের সংখ্যা এভাবে কমে আসার কারণ খুঁজতে পেরু সরকারের তরফ থেকে দেশ-বিদেশের এক্সপারটদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। আমাকেও সে তদন্ত কমিটিতে রাখা হয়েছিল।

—সেটি মানে 'সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্টিয়াল ইনস্টিটিউট' তাই তো? মানে যারা ভিনগ্রহীদের সন্ধানে হাপিত্যেশ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।—হেসে উঠল অনিলিখা।

—তা সেটির কাছেও একই ধরনের সংকেত। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তার পরে?

—তা তদন্তে নেমে দেখা যায় এসবের জন্য যে ব্যক্তি দায়ী, তিনি হলেন গিল হারভে। তখনই ওনার বয়স ষাটের মতো ছিল। ইংরেজ। এক অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। পুরো ঘটনা ঘটেছিল পেরুর এক অত্যন্ত প্রত্যন্ত প্রান্তে, মনু রিজার্ভ ফরেস্টে, যেখানে খুব কম লোকই যেতে পারে। ওখানে গিল লোকচক্ষুর আড়ালে গবেষণা করে প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন প্রাণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

—সে কি? তারপর?

—দেখুন এসব ব্যাপারে আমি ননডিসক্লোসার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী বিশেষ কিছু বলতে পারব না, কিন্তু এটুকুই বলব উনি যথেষ্ট সফলও হয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে আমাকেও গিলের দলের লোকের হাতে বন্দি হতে হয়। এক রাতে গিলের দেখা পাই। তাই খুব বেশি খেয়াল নেই। শুধু লোকটার বলার ভঙ্গি বেশ অন্যধরনের এটুকু মনে আছে। মূলত আমার জন্যই ওনার সব কর্মকাণ্ডের কথা ফাঁস হয়ে যায়। অবশ্য আমি না থাকলেও হয়তো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ওনার সে সব কাজ ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু সে যে কারণই হোক না কেন, বেঁচে থাকলে ওনার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য যে আমি হতাম, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

—তা আপনার হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন যে এতে গিল হারভে যুক্ত আছেন?

—এভাবে ভিক্টিমদের নামের আদ্যক্ষর পরপর সাজালে ওনার নাম যে পাওয়া যায়, এটা কি তাই প্রমাণ করে না! এতোটা মিল কি স্বাভাবিক? তা ছাড়া উনি আর এই ডেভ—দুজনের মধ্যে আরেক বড় মিল দুজনেই আশ্চর্য রকম প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। একই বিষয়ে কাজ করেন। দুজনেই নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করেন। এতটা মিল কাকতালীয় নয় কি? তাছাড়া ডেভের হঠাৎ উত্থান বা পরিচিতি হঠাৎ করে গিলের অন্তর্ধানের পর থেকেই।

—হুম, ঠিকই বলেছেন। মেকস সেন্স। তা ছাড়া খুনি প্রত্যেকক্ষেত্রে নিজের পরিচয় রেখে গেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। এটা বোঝানোর জন্য যে একই লোক এটা করছে, আর খানিকটা যেন আপনাকেই চ্যালেঞ্জ

জানানোর জন্য। দেখি অনিলিখা কী করতে পারে? এরকম একটা ভাব।

—একদম তাই।

—আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন। আপনি চাইলে আপনার পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

—না, না। তার কোনও প্রয়োজন নেই।

আরও কিছু কথার পরে ফোন রেখে দেয় অনিলিখা। নিজের প্রাণ নিয়ে অনিলিখা চিন্তিত নয়। এমনিতেও গিলের মূল উদ্দেশ্য অনিলিখাকে মারা হলে, এতদিন অনিলিখা বেঁচে থাকত না।

১৩

অনিলিখার জন্য স্পেশাল অভ্যর্থনা। গাড়ি থেকে নেমেই অনিলিখা দেখল, গেটের সামনে গণেশ আর মিস্টার পাই দাঁড়িয়ে আছেন। মিস্টার পাই পরে আছেন সাদা পায়জামা- পাঞ্জাবি। হাতে একটা চুরুট।

মিস্টার পাই-এর কাছে এসে অনিলিখা বলে উঠল—একী। চুরুট আবার কবে ধরলেন? আপনি ধূমপান করেন জানতাম না তো।

মিস্টার পাই উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসলেন। পাশ থেকে গণেশ একটা ইন্ডিয়ান কিংস সিগারেট-এর এক প্যাকেট শার্টের পকেট থেকে বার করে বলে উঠল—আর আমি সিগারেট শুরু করেছি।

—কেন হঠাৎ করে?

—স্যার, একটা অ্যান্টি এজিং ট্যাবলেট বার করেছেন। তাতে সিগারেট-চুরুট খেলে যা খারাপ এফেক্ট হয়, তা কেটে যায়। সেটা ঠিক কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা নিয়মিত সিগারেট, চুরুট এসব খাচ্ছি।

—তা কাজ করছে কিনা বুঝছেন?

—আহা, সে কি আর একদিনে বোঝা যায়, অন্তত মাস ছয়েক চেনস্মোকিং করতে হবে। তা এবার বলো কী জন্য আমার দরকার পড়ল?

—হ্যাঁ বলছি। আমাকে বাড়ির ভেতরে যেতে দেবেন তো। আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যাবে না দেখছি।

—কেন?—বলে হেসে উঠলেন মিস্টার পাই।

—আর কেন? এখনকার দিনে আপনার কাছে কোনও সেলফোন নেই। গণেশকে ফোন করলে বেশিরভাগ সময় বলে আপনি কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে জানায় কিনা তা-ও বুঝি না। আপনি কোনওরকম সোশ্যাল নেটওয়ার্কেও থাকেন না। কোনও দিন ব্যবহার করেন না। এর পরে আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখা যায়? এতবার ফোন করার পরে কালকে গণেশ বলল—আজকে আপনার সঙ্গে সকাল দশটা পনেরোতে এলে দেখা করা যাবে।

আবার হেসে উঠলেন মিস্টার পাই।—দেখো আমি নিজে বিজ্ঞানী হয়ে প্রযুক্তির থেকে খানিকটা দূরত্ব রাখার চেষ্টা করি। আমরা বুঝতেও পারি না, কীভাবে এই সব প্রযুক্তিগুলো আমাদেরকে আস্তে আস্তে পালটে দিচ্ছে। যেমন ধরো, 1995 সাল অবধি যখন আমাদের হাতে সেলফোন ছিল না, বেশিরভাগ বাড়িতেও ফোন ছিল না। তখন আমরা এক সপ্তাহ আগে থেকে বলে রাখতাম এই দিন এই সময় এই জায়গায় দেখা হবে।

এখন তুমি তা ভাবতে পারবে? প্ল্যান করলেও শেষ মুহূর্তে সে প্ল্যান পালটে যাবে, কারণ তুমি জানো শুধু একটা ফোন করে যখন ইচ্ছে এই প্ল্যান পরিবর্তন করা যায়। এর জন্য কি হয়েছে জানো? এর প্রভাব পড়েছে আমাদের স্বভাবে, আমাদের ব্যবহারে, আমাদের সম্পর্কে।

—তা আমিও কি এ পরীক্ষার অংশ?

—একদম তাই। বলতে পারো তোমাকেও যে দেখা করার একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, তার কারণ তুমিও এই পরীক্ষার অংশ। আমরা প্রযুক্তির পরিবর্তনের কথা ভাবি, কিন্তু প্রযুক্তির থেকেও যে আমরা তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছি, তা খেয়াল করি না। আগে আমরা কত কথা বলতাম, এখন দুজন সামনাসামনি হলেও কথা বলার বিষয় খুঁজে পাই না। এখন চোখের সামনে যে সে অনেক দূরের। আর বহু দূরে হাজার মাইল দূরে যাকে কোনওদিন দেখিনি, চিনি না, তাকে ভাবি সে কত কাছের। তাই না?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা প্রযুক্তি কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার অনেক খবর রাখি। নিজের পরিবর্তনটা বুঝতেও পারি না।

মিস্টার পাই বলে উঠলেন—চলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা বলব না। ভেতরে যাই।

মিস্টার পাই-এর সঙ্গে ড্রয়িংরুমের সোফায় এসে বসল অনিলিখা। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকটা নতুন বুক কেস। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অনিলিখা বলে উঠল—আপনি তো প্রচুর বাংলা বই পড়ছেন দেখছি? বিশেষ করে কিশোর সাহিত্য।

—মনের বয়সটাকে বাড়তে দিই না। ওই সব বই পড়ে যেদিন আনন্দ পাব না, সেদিন বুঝব সত্যি বয়স বেড়েছে।

আরেকটা চুরুট ধরিয়ে অনিলিখাকে বলে উঠলেন—তা বলো কি জন্য তোমার আসা।

অনিলিখা বলে উঠল—খবরের কাগজ পড়ছেন? খবরটা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, ওই কঙ্কাল কাণ্ড তো?

—ঠিক তাই। কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। এর ব্যাখ্যা একমাত্র বিজ্ঞানের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তা আপনার কী মনে হয়?

—দেখো, অনুমান নির্ভর কিছু বলা উচিত নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানী হয়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, এখানে মানুষ খুন করছে না। করছে অন্য কিছু।

—আমারও তাই ধারণা। আচ্ছা, আপনি অপরাজিত বসুর নাম শুনেছেন কিনা জানি না। ওনার সঙ্গে আমার আগে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বিপদে পড়ে। এখানে আসার পরে খুব রহস্যজনকভাবে মারা যান।

—হ্যাঁ, ওনার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যদিও কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি। খুব বড় মাপের ম্যাথামেটিশিয়ান। কাগজে ওনার মৃত্যুর খবরটা পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কী বিপদে পড়েছিলেন? ও ব্যাপারটা আমার জানা নেই।

—জাল নোট তৈরির ব্যবসার সঙ্গে কোনওভাবে ওনার নাম জড়িয়ে পড়ে। সে ব্যাপারে ওনাকে ইংল্যান্ডে জেলেও যেতে হতে পারত। তাই আগেই উনি পালিয়ে আসেন। যাতে উনি নিজে যে-কোনও অপরাধ করেননি, তা প্রমাণ করতে পারেন। আমিও নিশ্চিত যে ওনার মতো মানুষ, কখনও লোক ঠকাতে পারে না। তা শেষ দিকে উনি কীসের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটা জানার দরকার।

—অঙ্কের দারুণ প্রতিভা। এক কথায় জিনিয়াস। ওনার অনেক বই আমার কাছে আছে। বছর দুয়েক আগে ওনার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। মৌলিক সংখ্যা আর জীবনের মধ্যে সম্পর্ক। কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মৌলিক সংখ্যা ঘুরে ফিরে আমাদের সামনে আসে। খুব নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা।

—এখানে আসার পরে উনি হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিনের জ্বরে মারা যান। ডাক্তার কিছু না বললেও আমার ধারণা ওনাকে বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছিল।

—সে কী? তা কী কারণে ওনাকে মারা হতে পারে? কিছু ধারণা করতে পেরেছ?

মৃত্যুর আগে উনি সঙ্কেতের মাধ্যমে একটা মেসেজ রেখে যান মেয়ের জন্য। আমি সেটা ডিকোড করতে পেরেছিলাম। তাতে উনি লিখে যান যে উনি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু তা এখন খুব খারাপ

লোকের হাতে। যে-কোনও সময়ে পৃথিবীতে তার জন্য সাংঘাতিক কোনও বিপদ হতে পারে। ডেভ—বলে কোনও একজনের থেকে সে বিপদ আসতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

—নতুন প্রাণ।—বিড়বিড় করে উঠলেন মিস্টার পাই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। আবার বলে উঠলেন—নতুন প্রাণ। এ ব্যাপারে প্রথম সাফল্য পান ভেন্টার। খুব কম সংখ্যক জিন দিয়ে নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেন। ডেভ-এর নামও আমি শুনেছি। যার নাম শুনেছি তিনি মাইক্রোবায়োলজির উপরে গবেষণা করে এমন একটা সংস্থার অধিকর্তা। নিজে খুব সম্ভবত ব্যাক্টেরিয়োলজিস্ট। ওই সংস্থা খুব ভালো কিছু কাজ করছিল, এরকম শুনেছি। বছর খানেক আগে ওখানকার কাজ নিয়ে বেশ কিছু লেখাও চোখে পড়েছে। কিন্তু তার পরে গত এক বছর সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। আমি একটু এনার উপরে খোঁজ নিয়ে দেখি।

—তবে সেই ডেভ আর অপরাজিতবাবুর উল্লেখিত ডেভ এক না-ও হতে পারে। আর অপরাজিতবাবু তো ম্যাথেমেটিশিয়ান। উনি ডেভের সঙ্গে একসঙ্গে কি কোনও কাজ করবেন?

—এটাই ভুল ধারণা। বিজ্ঞানের সব শাখা এক জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। আর সেখানে ওদের অপরাজিতবাবুকে দরকার হয়ে থাকতেই পারে।

—আচ্ছা, ধরুন—বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা।

—তুমি যেটা ভাবছ, আমিও সেটাই ভাবছি। এই যে খুনগুলো হচ্ছে তাতে এই ধরনের বিশেষ কোনও মাইক্রোব, মানুষেরই হাতে তৈরি কোনও মাইক্রোব, ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, তাই ভাবছ তো?

—একদম আমার মনের কথাটাই বলেছেন। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? এ ধরনের মাইক্রোব কি তৈরি করা সম্ভব, যারা এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহকে কঙ্কালে পরিণত করবে? আর তা ছাড়া এভাবে এ ধরনের মাইক্রোবকে কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

—অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হতেও পারে। তবে তুমি যাকে নিয়ন্ত্রণ করছ, সে যে কালকে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? আর তাই এ নিয়ে গবেষণার অনেক বাধানিষেধ আছে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এ ধরনের মাইক্রোবের মিউটেশন এমনিতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয়। যদি কোনওভাবে এই মিউটেশনের বা পরিবর্তনের হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এদের মধ্যে এক বছরে যে পরিবর্তন আসতে পারে, তা আমাদের মধ্যে আসতে কয়েক লক্ষ বছর লেগে যায়।

—আপনি কি তাহলে এই খুনগুলোতে এই মাইক্রোবের ভূমিকা নিয়ে কিছু আশঙ্কা করছেন?

মিস্টার পাই আস্তে আস্তে বলে উঠলেন—এ ধরনের প্রাণ তৈরি করা, তাকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা, আগুন নিয়ে খেলার মতো। সে আগুনে কখন নিজের ঘর পুড়বে সেটাও বলা মুশকিল।

—আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আপনি তো বিখ্যাত বিজ্ঞানী গিল হার্ভের কথা জানেন। সেবারে উনি বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করছিলেন। আমার ধারণা হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মধ্যে উনি মারা যান। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। উনি বেঁচে আছেন। হয়তো কলকাতাতেই আছেন। আর এই যে একের-পর-এক খুন হচ্ছে, তার মূল পাণ্ডাও আমার ধারণা ওই গিল। ওই যে খুনগুলো হয়েছে, যারা মারা গেছে, তাদের প্রথম নামের আদ্যক্ষর পরপর সাজালে তাই ওনার নামই পাওয়া যায়। তবে আর বোধহয় খুন হবে না। উনি শুধু এখন অবধি যা কিছু করেছেন তা শুধু আমাকে বোঝানোর জন্য যে উনি এখনও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। আর একইসঙ্গে প্রমাণ রেখে গেছেন যে উনি চাইলে কি করতে পারেন। খুব সম্ভবত গিল আর ডেভ একই লোক।

—যে শুধু তার ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যই এতকিছু করতে পারে, সে আসলে কী করতে চায় সেটা জানা খুব দরকার। মারাত্মক কিছু একটা হতে চলেছে। লোকটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়। তুমিও খুব সাবধানে থেকো। সত্যি চিন্তার কথা।

মিস্টার পাই আরেকটা চুরুট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

১৪

কালকে ভোরবেলা দিল্লি যেতে হবে দুদিনের জন্য। অফিস থেকে ফিরে আসতে রাত হবে। অফিসে যাওয়ার আগেই তাই ব্যাগ গোছাচ্ছিল অনিলিখা।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ফোনটা ধরতেই উলটো দিকে রাজর্ষির উত্তেজিত গলা—খবরের কাগজটা দেখেছেন?

—না, আজকে পড়ার সময় পাইনি এখনও।

—শিগগির গিয়ে দেখুন। লোকটা মারাত্মক কিছু একটা করতে যাচ্ছে। রীতিমতো আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে কালকে কাগজের অফিসে একটা চিঠি দিয়েছে। মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। আগে চট করে একবার দেখে নিন।

আপনার বর্ণনা মতো আমরা সর্বত্র 'গিল হার্ভে'-র খোঁজ করছি। তবে এখনও কোথাও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন হোটেলেও খোঁজ নিয়েছি আমরা। ভাবছিলাম খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি হাতে একদম সময় নেই।

চিঠিতে একটা সঙ্কেতের উল্লেখ আছে। সেটা আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমাদের বেস্ট এক্সপার্টরা কাজ করছেন। দেখা যাক, কিছু বোঝা যায় কিনা তার থেকে।

ফোন ছেড়ে কাগজ নিয়ে খুলে বসল অনিলিখা। প্রথম পাতায় খবর।

Beware Kolkata, You're In Danger.

একটা ছোট চিঠি টাইপ করে কাগজের দপ্তরে পাঠিয়েছে লোকটা। দাবি করেছে যে সে-ই নাকি কঙ্কাল কাণ্ডের সব খুনের মূলে। তাতে একটা সঙ্কেত পাঠিয়েছে। আর তার নীচে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—'পারলে বাঁচাও। সময় কিন্তু খুব কম।'

টিভি খুলল অনিলিখা। কলকাতা একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। সকাল এখন 7 টা। তাই এখনও অফিসে যাওয়ার সময় শুরু হয়নি। কিন্তু এখনই এ খবর নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে।

একজন তো খবরে বলেই বসল—যাকে পুলিশ এতগুলো খুনের পরেও ধরতে পারেনি, কী করে নিশ্চিত হব যে কলকাতার পুলিশ তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে।

সত্যি কথা। এত বড় শহর। এত লোকের বাস। কোথায় কী করবে কিছু বলা যায়?

সঙ্কেতটা খুব বড় কিছু নয়। কিছু সংখ্যা আর অক্ষর। পুরো চিঠিটার সঙ্গে কাগজে সঙ্কেতটাও প্রকাশ হয়েছে।

```
1 X 7 B 5 R T H J R C U P 9 X 3 S N R 4 R W M N P S
A U W M 6 5 O T N S E I W D Z 5 P O 5 W N 5 4 3 O Q
N T S R M 6 R I N M 8 A M 1 P L T X T 3 5 2 X Z Y 2
R O O S 9 5 8 2 M L 3 N 8 R O 4 R Z M R 7 5 W X 7 5
O 4 3 2 8 7 6 X O P 4 T Q 9 P R 6 X S P S R 4 2 Q P
N 6 7 S 4 8 9 5 M 9 9 S T 4 9 T 5 W X R 6 T U V W 4
```

অফিসের তাড়া আছে। তবু অনিলিখা কাগজটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভাবল। কাগজে হিজিবিজি কাটল। কিছুই মাথায় এল না।

কী জানাতে চেয়েছে গিল? অবশ্য এর পিছনে যদি গিলই থেকে থাকে।

রাজর্ষি কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ডেভ-এর খোঁজ করেছে। ডেভ-এর সংস্থা 'নিউ লাইফ' প্রায় ছ'মাস আগে বন্ধ হয়ে গেছে। আপাতত ডেভ-এর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে অপরাজিতবাবুর ট্যাক্স রিটার্ন থেকে জানা গেছে যে উনি ওই 'নিউ লাইফ' সংস্থার সঙ্গে বেশ কিছু দিন ডাইরেক্টর হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগ 'নিউ লাইফ'-এর কাজকর্ম, কারা কারা যুক্ত ছিলেন সে সব বিশদভাবে জানতে একজন গোয়েন্দাকে ইংল্যান্ডে গত পরশু পাঠিয়েছে।

নাহ, এরকম বিপদের সময় কলকাতা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অনিলিখা ঠিক করল দিল্লি যাওয়া পিছোবে। এই মুহূর্তে যতদিন এই বিপদ না কাটছে, কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না।

আমি তোমার চ্যালেঞ্জ নিলাম গিল, আমি থাকতে কলকাতার কিছু ক্ষতি হতে দেব না।—অনিলিখা নিজের মনে বলে উঠল।

১৫

—অনিলিখা, মিস্টার পাই বলছি।

—হ্যাঁ বলুন। আপনার নাম্বারটা সেলফোনের মনে হচ্ছে? একি স্বপ্ন দেখছি?

—কী আর করা যাবে? বাধ্য হয়ে সেই প্রযুক্তির কাছেই দাসত্ব স্বীকার করতে হল। যদিও এটার থেকে আমি বেশ খানিকটা দূরত্ব রাখব ঠিক করেছি। এটা তাই গণেশের কাছেই রেখেছি।

তা যে জন্য এই ফোনটা করছি। আমি ডেভ সম্বন্ধে খানিকটা খোঁজখবর নিলাম। তোমার সন্দেহটা হয়তো ঠিক। ডেভ ও গিল হারভে একই লোক হতে পারে। প্রায় হঠাৎ করে পাঁচ বছর আগে বিজ্ঞানী মহলে ডেভ-এর নামটা উঠে আসে। তার আগে ওনার নাম কখনও শোনা যায়নি। তার পরে হঠাৎ করে একাধিক রিসার্চ পেপারে ওনার কাজের উল্লেখ দেখি। 'নিউ লাইফ' সংস্থাটা সম্বন্ধেও একই ব্যাপার। গত বছর ওই সংস্থার দুজন বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেন। হঠাৎ করে এই সংস্থা দেউলিয়া ঘোষিত হয়।

—তা এই ডেভ-এর কোনও ছবি পাওয়া গেছে? বা এই সংস্থার কাজ করার আগে কোথায় যুক্ত ছিলেন সেরকম কোনও পরিচয় পাওয়া গেছে?

—না, সেটাই মজার। কোথাও কোনও ছবি নেই। আগে কী করতেন বা কোথায় পড়াশোনা করেছেন তার সম্বন্ধেও কোথাও কোনও উল্লেখ নেই। এটা নিশ্চিত যে এই ভদ্রলোক শুরু থেকেই তার আসল পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। তা-না হলে আজকের দিনে এত বড় একজন বিজ্ঞানী হয়ে এভাবে পরিচয় লুকোনো যায় না। আর কী জন্য লুকিয়েছেন তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

—গিল হার্ভের কোনও খোঁজ পেয়েছেন?

—না, একই সঙ্গে গিল হার্ভের উল্লেখ কোথাও নেই। সেই তোমাদের পেরুর ঘটনার পর থেকে ম্যাজিকের মতো উধাও। তিনিই যে অন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

—তা মিস্টার পাই, যদি এনার হাতে সত্যিই কোনও শক্তিশালী মাইক্রোব তৈরি হয়ে থাকে, তা দিয়ে কি কোনওরকম মাস মার্ডার সম্ভব? আপনার কী মনে হয়?

—দেখো যেখানে আমরা নতুন প্রাণ তৈরি করছি, সেখানে আমরাই ঈশ্বর। আমরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। এখানে আমরা বলতে পারো শূন্য থেকে শুরু করছি। তাকে কী ক্ষমতা দেবে, তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, সে কীভাবে কাজ করবে, কীভাবে আত্মপ্রকাশ করবে পুরোটাই আমাদের হাতে ডিজাইন করা। জিন থেকে শুরু করে। তাই আমাদের চেনাজানা কোনও মাইক্রোব বা প্রাণীর সঙ্গে তাকে তুলনা করলে আমরা ভুল করব।

তাই এই ধরনের মাইক্রোব যে কী করতে পারবে আর পারবে না, তা বলা সত্যি মুশকিল। এ ধরনের সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার হাতে অনেক দায়িত্ব আসে। সেখানে যদি আমরা সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করি, তবে খুবই বিপদ।

—হ্যাঁ, আর তা ছাড়া মিস্টার পাই, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া লক্ষ লক্ষ বছরের অভিযোজনের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে তাদের স্থান করে নিয়েছে। আর আমরা এখানে কী করছি। সে সব প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে এমন এক প্রাণ নিয়ে এসেছি যে হয়তো নিজেই নিজের নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করবে।

—একদম ঠিক বলেছ অনিলিখা। আর সেখানেই এ ধরনের প্রাণী আমাদের পরিচিত সব প্রাণীর থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

একটু থেমে মিস্টার পাই বলে উঠলেন—তা গোয়েন্দারা গিল বা ডেভ-এর কোনও খোঁজ পেল? রাজর্ষি কী বলছে?

—না এখনও পায়নি। উলটে শুনছি অহেতুক অনেক বিদেশিদের ধরপাকড়, হেনস্থা করা হচ্ছে। নাম ডেভ-এর কাছাকাছি কিছু হলে তো কথাই নেই। বুঝুন অবস্থা। ভয় হচ্ছে যে শেষ কয়েকদিন যেরকম চুপচাপ, তাতে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ঠিক যেন ঝড়ের আগের নীরবতা। সত্যিই কি কলকাতার বড় বিপদ? কে জানে?

ফোনটা রাখতেই অনিলিখার মনে পড়ল আট বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর রাতে গিলের বলে যাওয়া সেই কথা। 'বিজ্ঞানীর কাজ বিজ্ঞানকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমাজকে নয়। বিজ্ঞানী স্বাধীন, তার কোনও দায়িত্ব নেই।'

যে বিজ্ঞানী এরকম কথা বলতে পারেন, তাঁর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। হ্যা, নিজের হাতে তৈরি নতুন মাইক্রোবের ক্ষমতা প্রমাণ করতে তিনি লক্ষ লোককে মারতেও দ্বিধা করবেন না। এর জন্য ওই কি দায়ী? গিল কি অনিলিখার জন্যই কলকাতার ক্ষতি করতে চাইছে? নাকি কলকাতাকে উনি বেছে নিয়েছেন জনসংখ্যার জন্য।

১৬

আরেকটা শনিবার এসে গেল। নাহ, আজ আর শনিবারের আসরে যেতে ইচ্ছে করছে না অনিলিখার। অনেক কাজ। একবার মধ্যমগ্রামে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ওখানে নিজের হাতে আবাসিকদের জন্য কিছু রান্না করে নিয়ে যায়। অনিলিখা ওখানে গেলেই প্রায় উৎসব শুরু হয়ে যায়। আসলে অনেকেই ওখানে আছেন, যাদের ছেলে-মেয়েরা বাইরে বিদেশে বহু বছর থাকেন। অনেকে খোঁজও রাখে না। তাদের কাছে আজ অনিলিখাই সবথেকে বেশি আপনার।

আজকে ঠিক করেছে সবার জন্য পায়েস করে নিয়ে যাবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে বেশ কিছু বই, পত্রিকা। বই পড়লে এনাদের শুধু সময় যে ভালো কাটবে তাই না, এনারা মানসিক দিক দিয়েও অনেক বেশি সুস্থ থাকবেন।

এর মধ্যে আবার ফোন বেজে উঠল। তন্ময়ের।

—আজকে আসছ তো অনিলিখাদি?

—না রে, আজকে আর আসতে পারব না। অনেক কাজ আছে। আজকে অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—সে কী? তুমি নির্ঘাত ওই কঙ্কাল কাণ্ডের জন্য এখনও ছোটাছুটি করছ।

—সে আর এগোল কোথায়।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিলিখা ফের বলে উঠল—আজকে মধ্যমগ্রাম যেতে হবে। তার আগে বেশ কিছু বই-পত্রিকা কিনতে হবে কলেজ স্ট্রিট থেকে। আর তোকে তো গিল-এর কথা বলেছিলাম। সেই মনে হয় এর পিছনে আছে। কিছু জায়গায় আজকে ওনার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে আছে।

—তা কাগজে যে সঙ্কেতটা বেরিয়েছিল, সেটা কিছু উদ্ধার হয়েছে? টিভিতে ওটা নিয়ে তো মাঝেমধ্যেই অনেক আলোচনা হচ্ছে।

—ধুর, গত পাঁচ দিনে গোয়েন্দা দপ্তর কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। আর টিভিতে শুধু তাই নিয়ে খেজুরে আলাপ- আলোচনা চলছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রাজর্ষি বলছে ওই মেসেজটার মূলে আছে কোনও একটা 'কি ওয়ার্ড'। ওই 'কি ওয়ার্ড' যতক্ষণ না উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই সঙ্কেত উদ্ধার সম্ভব নয়।

—তা গিল হঠাৎ কলকাতা বাছল কেন বলো তো?

—এত লোক যে শহরে, সে শহর টেররিস্টদের ভালো টার্গেট হয়। তা ছাড়া মূল কারণটা বোধ হয় আমি। আমার উপরে তো ভারী রাগ। আগেরবার সব কিছু আমার জন্যই ভেস্তে যেতে বসেছিল।

—তুমিও যেমন ওর কথা ভাবছ, ওই গিলও নিশ্চয়ই তোমার কথাই ভাবছে সারাক্ষণ।

—হ্যাঁ, তা হবে হয়তো। কাগজের সেই সঙ্কেতটা—বলে একটু থেমে গেল অনিলিখা—দাঁড়া, একটা কথা তুই দারুণ বলেছিস।—ফোনটা ছাড়ছি। একটু ভাবতে হবে।

বলে চট করে ফোনটা কেটে দিয়ে, অনিলিখা ছুটে গিয়ে সেদিনের কাগজটা বার করল। তার পরে একটা কাগজ পেন নিয়ে বসে গেল। সেই সঙ্কেতটা বার করল। সেদিনের পরে সঙ্কেতটা নিয়ে আর বেশি সময় দেওয়া হয়নি। ভেবেছিল গোয়েন্দা বিভাগের এক্সপার্ট টিম যখন কাজ করছে, তখন ওরাই এর সমাধান খুঁজে বার করতে পারবে।

ইংরেজিতে লেখা বেশ কিছু অক্ষর আর সংখ্যা। পরপর 26 টা অক্ষর এক লাইনে। এরকম ছ'টা লাইন আছে। কিন্তু না আছে কোনও অর্থ, না আছে কোনও প্যাটার্ন।

ইংরেজি অ্যালফাবেটে 26 টা অক্ষর আছে। এখানেও ছ'টা লাইনের প্রত্যেকটাতে 26 টা করে অক্ষর বা সংখ্যা। আচ্ছা, ওই অক্ষরগুলোর ঠিক উপর দিয়ে যদি A, B, C করে Z অবধি লেখা হয়, কী হয়।

তন্ময় একটা খুব দরকারি কথা বলেছে। গিল—কার কথা সবার আগে ভাববে। অনিলিখা। ANILIKHA। এই অনিলিখাই যদি 'কি ওয়ার্ড' হয়।

'A' 'N' 'I' 'L' 'I' 'K' 'H' 'A' এই অক্ষরগুলোর ঠিক নীচের সংখ্যা বা অক্ষরগুলো খুঁজে নিল অনিলিখা। পরপর 6 লাইন জুড়ে। তাতে যে লেখাটা বেরিয়ে এসেছে তা হল—19 Jun Chandni Metro 10 AM।

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[1_{1}] X 7 B 5 R T [H_{7}] [J_{3}] R [C_{6}] [U_{4}] P [9_{2}] X 3 S N R 4 R W M N P S

[A_{8}] U W M 6 5 O [T_{15}] [N_{5}] S [E_{14}] [I_{12}] W [D_{10}] Z 5 P O 5 W N 5 4 3 O Q

[N_{9}] T S R M 6 R I [N_{11}] M 8 [A_{20}] M [1_{18}] P L T X T 3 5 2 X Z Y 2

[R_{16}] O O S 9 5 8 2 [M_{13}] L 3 N 8 R O 4 R Z M R 7 5 W X 7 5

[O_{17}] 4 3 2 8 7 6 X [O_{19}] P 4 T Q 9 P R 6 X S P S R 4 2 Q P

N 6 7 S 4 8 9 5 [M_{21}] 9 9 S T 4 9 T 5 W X R 6 T U V W 4

তার মানে? আজকেই তো 19 June। ঘড়িতে এখন সকাল ন'টা বেজে দশ। ঠিক পঞ্চাশ মিনিট বাকি।

১৭

রাজর্ষির সঙ্গে চটজলদি কথা বলে নিল অনিলিখা। কীভাবে অনিলিখা ওর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বোঝাতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ওর সঙ্গে কথার মধ্যেই রাজর্ষি রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোরসের সঙ্গে যোগাযোগ করল। প্রত্যেক মেট্রো স্টেশনে কুইক রেসপন্স টিম থাকে। তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল।

অনিলিখার বাড়ি চাঁদনি থেকে বেশি দূরে নয়। পাশেই গিরিশ পার্ক মেট্রো। অনিলিখা জানাল ও পুলিশের সঙ্গে না গিয়ে মেট্রোতে করে এখনই চাঁদনি স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেটাই তাড়াতাড়ি হবে। ওখানে গিয়েই রাজর্ষির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

কোনওরকমে একটা সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এল অনিলিখা। মেট্রো পেতেও দেরি হল না। ট্রেনে অফিসের ভিড়। ধাক্কাধাক্কি। কিন্তু চাঁদনির আগের স্টেশন, সেন্ট্রালে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল।

আনাউন্সমেন্ট হচ্ছে 'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিছুক্ষণের জন্য চাঁদনি স্টেশনে রেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।'

তাড়াতাড়ি মেট্রো থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরল অনিলিখা। চাঁদনি মেট্রোর কাছে যখন পৌঁছোল তখন ঘড়িতে পৌনে দশ। স্টেশনের বাইরে বেশ কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ। স্টেশন খালি করা শুরু হয়ে গেছে। ভেতরে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সকলের মধ্যেই কৌতূহল। কানাঘুষো। কী হচ্ছে?

একজন তো অনিলিখাকেই সাবধান করল—বোমা আছে দিদি। যাবেন না। আল কায়দা অ্যাটাক করেছে।

পুলিশ কিন্তু বেশ ভালো কাজ করছে। বেশি লোক জড়ো হতে দিচ্ছে না। ভেতরে এতক্ষণে রেল পুলিশের 'কুইক রেস্পন্স ফোর্স' দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাজর্ষি এসে গেল। পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক। পোশাক দেখে মনে হয় গতকাল রাতে থানাতেই ছিল। চোখে-মুখে ক্লান্তি। খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে তার ছাপ। অনিলিখাকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। নীচে শুধু পুলিশের লোক আর কিছু মেট্রোর অফিসাররা আছেন। সাধারণ যাত্রীদের বার করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যস্ততার মধ্যেও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে অনিলিখার পরিচয় করিয়ে দিল রাজর্ষি।

সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই ধরা হবে। ডেভ-এর ডিটেলস সবার কাছে দেওয়া আছে। পুরোটাই অবশ্য অনিলিখার বর্ণনা থেকে আঁকার ভিত্তিতে।

পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে, কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা। আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল। কিছুই পাওয়া যায়নি। সব স্বাভাবিক। অনিলিখারই একটু অস্বস্তি লাগছে। চারদিকে এত বড় কর্মকাণ্ড, সবই ওর তথ্যের উপরেই নির্ভর করে। তা হলে কি ডেভ শেষ মুহূর্তে প্ল্যান পরিবর্তন করেছে? নাকি ও অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিল?

মহাত্মা গান্ধী স্টেশন থেকে স্প্লানেড স্টেশন, টানেলের ভেতর সব জায়গায় চিরুনি তল্লাশি হচ্ছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা।

সাড়ে দশটা অবধি কোনও কিছু না পেয়ে আবার মেট্রো চালু করে দেওয়া হল।

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল অনিলিখা। আর যাই হোক, একটা জিনিস বুঝেছে অনিলিখা যে বাইরে থেকে এই সব মেট্রো স্টেশনের নিরাপত্তা যতই নড়বড়ে মনে হোক না কেন, আসলে তা নয়। ভেতরে ভেতরে একটা বড় প্রস্তুতি থাকে, এ ধরনের অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্য। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য পুলিশ সব সময় প্রস্তুত থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রেল পুলিশের কমান্ডোরা যে ভাবে পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল তা সত্যি দেখার মতো।

মেট্রো থেকে বাইরে বেরিয়ে কাছাকাছির কোনও একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। কেউ সঙ্গে থাকলে ভালো হত। একা তো আর খেতে ভালো লাগবে না। তাই শেষে খেতে না গিয়ে কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় ঢুঁ মারবে ঠিক করল অনিলিখা। বাইরে এখনও বিশাল লাইন মেট্রোতে ঢোকার। এরকম অফিস টাইমে হঠাৎ করে মেট্রো বন্ধ হওয়ার খবর শুনে লোকে গালমন্দ করছে। এরা কখনও জানতেও পারবে না আসলে কী হয়েছিল, বা কি সন্দেহ করা হচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল অনিলিখা। হঠাৎ চোখ পড়ল পাশে ট্র্যাফিকে আটকে থাকা উবের ট্যাক্সির দিকে। পেছনের সিটে একজন ছোটখাটো চেহারার লোক বসে আছে। গাঢ় বাদামি রং। গায়ে লাল চাদর জড়ানো। গোল মতো মুখ। ভোঁতা নাক। নীচের ঠোঁটটা সামনের দিকে অস্বাভাবিক রকম ঝোলা, চিবুকে এসে ঠেকেছে।

চোখাচোখি হতেই লোকটা অনিলিখার দিকে বিশেষ অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে উঠল। আর তারপর বন্ধ কাচের উপরে দাগ কাটল। একটা বৃত্ত। তার পরে আরেকটা বৃত্ত।

ট্র্যাফিক লাইট ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে। অনিলিখার অবাক চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে গেল। চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যেতেই অনিলিখা বুঝল যে এ ধরনের লোককে ও আগে কোথায় দেখেছে।

আট বছর আগে সেই অগ্ন্যুৎপাতের রাতে আমাজনের জঙ্গলে যাদের সঙ্গে ও টটোরা বোটে পালিয়েছিল, যাদের সাহায্যে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের হাত থেকে বেঁচেছিল, এ তাদেরই একজন। সেই পেরুর উপজাতি, যারা ভিনগ্রহীদের ভাষা বোঝে। যাদের ভাষা আজও তাই বৃত্তের ভাষা। আর তাই বোঝানোর জন্যই গাড়ির জানলায় বৃত্তের দাগ দিয়ে কিছু যেন লিখছিল লোকটা।

তাহলে কি অনিলিখার অনুমান ঠিক? এখানে কি ডেভ-এর প্ল্যান ওরাই বানচাল করে দিল। কিন্তু ওরা টের পেল কী করে? কেনই-বা এ লোকটা এখানে এল? তাহলে কি এই লোকটা এখানে ভিনগ্রহীদের নির্দেশে তাদের সঙ্কেত পেয়েই এসেছে। ও নিজের চোখে দেখেছে গাড়ির জানলায় আঁকা সেই বৃত্ত। সেই একই ভাষা।

ফোন বাজছে। রাজর্ষির গলা—

—অনিলিখা, আপনার ধারণা একদম ঠিক। এখানে মেট্রোর ট্রেন কন্ট্রোল রুমের ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি যেখানে আছে, তার মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সঙ্গে একটা ছোট ভায়াল।

আমাদের ধারণা এটা ডেভ-এরই। পকেটে ওর ওয়ালেট পাওয়া গেছে। আপনি কি কাছাকাছি আছেন? পারলে একবার এখনই চলে আসুন। কী করে ডেভ এখানে ঢুকল, কেই-বা ওকে মারল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আপাতত। ডেভ নিজেই কীভাবে শিকারে পরিণত হল তা বোঝা যাচ্ছে না।

১৮

ফেয়ারলি প্লেসে ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে মিটিং হচ্ছে। রেলের ও পুলিশের বড় কর্তারা তো আছেনই, রাজর্ষিও আছে। অনিলিখা আর মিস্টার পাইকে ওনারা অনুরোধ করেছিলেন থাকার জন্য, যাতে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া যায়।

সেদিনকার ওই কঙ্কালটা যে ডেভ-এর ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কঙ্কালের পায়ে যে মোজা ছিল তার ফাইবার আগে পাওয়া মোজার ফাইবারের সঙ্গে মিলে গেছে। প্যান্টের পকেটে যে ওয়ালেট পাওয়া গেছে, তাতে ডেভ-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে। সঙ্গে একটা শূন্য ভায়াল, যাতে ওই মাইক্রোব রাখা ছিল। সেই আসল খুনিকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে তার হাতেই যে তার স্রষ্টার মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এসি ডাকটের বাতাসে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যই কি ওই ভায়াল ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ডেভ? নাকি কোনওভাবে ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম যারা পরিচালনা করে তাদের আক্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন? সেটা হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত ভাবাই যায় না।

ঘটনা ঘটার অনেক আগেই উনি নিজেই ওনার পোষ্যের শিকার হয়েছেন। তাই সেই ভায়ালের মাইক্রোব কেন ডেভকেই একমাত্র আক্রমণ করল, সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন।

মিস্টার পাই মিটিং রুমের এক কোণে বসে টেবিলে রাখা কাজু চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। আর মাঝেমধ্যে বিশাল হাই তুলছিলেন।

এ বিষয়ে ওনার মতামত জিগ্যেস করতে প্রথমে বিষম খেলেন। তার পরে সেটা সামলে বলে উঠলেন—ডেভ এদের ব্যবহার করেই বারবার খুন করছিল। দেখাতে চাইছিল যে সে চাইলে কী করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে তা হয়নি সেটা পরিষ্কার। ডেভ কিছু করার আগেই অন্য কেউ এসে ডেভ-এর হাত থেকে ওই মাইক্রোবগুলোর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়েছিল আর প্রয়োগ করেছিল ডেভ-এর উপরেই। প্রশ্ন হল কে সেই লোক?—মিস্টার পাই অনিলিখার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—তুমিই বাকিটা বলো অনিলিখা।

অনিলিখা বলে উঠল—অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের যুক্তিতর্কের বাইরে হয়। এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে এমন একটা বিষয়ের উপরে, যা আমরা কেউ মন থেকে সহজে মেনে নিতে পারব না। আপনারা হয়তো জানেন কয়েক বছর আগে আমাকে পেরুতে এক অভিযানে যেতে হয়েছিল। তার মূলে ছিল দূর গ্রহ থেকে অ্যারেকিবো টেলিস্কোপে পাওয়া কিছু সঙ্কেত। সে সঙ্কেত আমরা প্রথমে না বুঝলেও পেরুতে এমন এক উপজাতির সন্ধান পাই, যারা সে সঙ্কেত বোঝে। সে উপজাতি পেরুর ঠিক কোথায় থাকে তা কেউ জানে না। সরকারের রেকর্ডে থাকা উপজাতিদের মধ্যেও ওরা পড়ে না। মজার কথা হল ওরা শুধু যে এই সঙ্কেত বুঝতে পারে তাই না, সেই ভাষাতে কথাও বলে।

তারা ও সেই ভিনগ্রহীরা একই কিনা, সে বিতর্কে যাব না, তবে এত বছর বাদে সেদিনই আমি তাদের একজনকে প্রথম দেখি, ওই চাঁদনি মেট্রোর কাছে। ব্যাপারটা আমাকে তখন অবাক করেছিল। এখন মনে হয় বুঝেছি। ওরাই ছিল ডেভ-এর মৃত্যুর মূলে। ওই মাইক্রোব দিয়ে ডেভকেই আক্রমণ করে এ যাত্রায় বহু লোকের জীবন বাঁচায় ও।

—এসব তো গল্পের মতো মনে হচ্ছে।—হেসে উঠলেন রেলের এক উচ্চপদস্থ অফিসার।

—এর আরেকটা জোরালো ভিত্তি আছে। প্রায় আট বছর বাদে অ্যারেকিবো টেলিস্কোপ ঠিক একইরকম সঙ্কেত পেয়েছে। আগেরবারের মতো এবারেও এই সাঙ্ঘাতিক বিপদের কথা ভিনগ্রহীরা আমাদের আগেই টের পেয়েছিল। আর তাই আমাদের সাবধান করার জন্য এই সঙ্কেত পাঠিয়েছিল। আপনাদের এ বিষয়ে আমি ডিটেলস দরকার হলে জানাতে পারি।

—কিন্তু সে মাইক্রোব গেল কোথায়?

—আমরা এখনও এই মাইক্রোব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবে যদ্দুর ধারণা এরা মানুষকে মারতে পারে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত করতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে যতক্ষণ মানুষ বা আক্রান্ত জীবের প্রাণ থাকে, ততক্ষণই এদের প্রাণ থাকে। আর তাই এদের কোনও অস্তিত্ব আমরা এবারেও খুঁজে পাইনি।

—কিন্তু আবার যদি এরকমভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা হয়?

—মনে হয় আর হবে না, কারণ আমরা বুঝতে না পারলেও এরা এখন ওই ভিনগ্রহীদের ভাষা বোঝে। তাদের আদেশ বোঝে। আর তাই এই মাইক্রোবরা আর মানুষের বিরুদ্ধে যাবে না। তবে আমাদের খুঁজে বার

করতে হবে আর কে কে এর সঙ্গে যুক্ত আছে। একটা লোকে তো আর সংস্থা চলে না। তবে মাথা যখন গেছেন, তখন বাকিদের ধরতে কষ্ট পেতে হবে না।

মিটিং আরও বেশ খানিকক্ষণ চলল। অনিলিখাকে ও মিস্টার পাইকে পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হল।

মিস্টার পাই বেরিয়ে এসে বললেন—চলো, সব দুশ্চিন্তা আপাতত শেষ। এবারে এ আনন্দে একটু চিংড়ির কাটলেট খাওয়া যাক।

—তা আপনার গাড়িটা কোথায় আছে?

—সেটা তো গণেশের সঙ্গে।

—তাহলে ফোন করে ডেকে নিন।

—সর্বনাশ। ওটাও তো গণেশের সঙ্গে।

—ঠিক আছে, আমার কাছে নাম্বার আছে। আমিই ফোন করছি।

একটু চিন্তিত ভাবে মিস্টার পাই বলে উঠলেন—দেখো পাও কিনা। আজকে সকালেই আমি ওকে বলেছি সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির থেকে দূরে থাকতে।

১৯

আবার শনিবারের আসরে আমরা জড়ো হয়েছি। আজ বলা যায় হাউসফুল। যারা নিয়মিত আসে, যারা মাঝেমধ্যে আসে, যারা প্রায় আসেই না—সবাই আজ হাজির। বিশ্বজিৎদাও আছে। তবে মূল আকর্ষণ অবশ্যই অনিলিখা। আমরা সবাই জানতাম আজ অনিলিখা আসবে। সে আকর্ষণেই সবার আসা।

কঙ্কাল কাণ্ড সমাধান হয়ে গেছে। মিডিয়ায় প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী যে সিরিয়াল কিলার এসব খুনের পিছনে ছিল, সে মারা গেছে। কিন্তু কীভাবে মারা গেছে বা পুলিশ কীভাবে তাকে মেরেছে তা পরিষ্কার করে কোথাও বলেনি। তাতে রহস্য আরও বেড়েছে। সেটা নিয়ে বাসে, ট্রামে, চায়ের দোকানে সর্বত্র আলোচনা চলছে।

আমরা শুধু এটুকু জানি যে এ ব্যাপারে একমাত্র যে জানতে পারে সে হল অনিলিখা। কিন্তু সত্যি কথা হল অনিলিখাকে এ-ক'দিন যোগাযোগ করা যায়নি। কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরেও ছিল এর মধ্যে। অবশেষে সে প্রতীক্ষার অবসান।

—ইনএফিসিয়েন্ট। আনপ্রফেশনাল। এত গুলো খুন হল। কীভাবে হল, কেন হল—কোনও উত্তর নেই। খুনি নাকি মারা গেছে! কী প্রমাণ? এরকমও তো হতে পারে যে খুনি কিছুদিনের জন্য জার্মানি বেড়াতে গেছে।—বিশ্বজিৎদার রাগটা কলকাতা পুলিশের উপরে হলেও খোঁচাটা যে অনিলিখার জন্য সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

অনিলিখা মাঝে কয়েকদিনের জন্য জার্মানি গিয়েছিল।

অনিলিখা কোনও কথা না বলে চেয়ারে বসে মন দিয়ে বাড়িতে বানানো মাংসের শিঙাড়া খাচ্ছিল।

শেষে এসব ইন্ডাইরেক্ট ট্যাকটিক্স কোনও কাজ করছে না দেখে আমাকেই আবার বলতে হল—তা তোমার কী মনে হয় অনিলিখাদি? কী হয়েছিল? তুমি তো এ ব্যাপারে নিজে ইনভলভড ছিলে।

—কী আবার? এসবের পিছনে ছিল এক বিশেষ মাইক্রোব, যাকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। একে তৈরি করা হয়েছিল মানুষ খুনের জন্য। খুব তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে কোনও মানুষের মাংস খেয়ে নিতে পারে। নিঁখুত অস্ত্র। মাইক্রোব সাধারণ চোখে দেখা যায় না। যে এর পিছনে থাকে তাকে ধরা আর শক্ত হয়ে যায়।

—কিন্তু পুলিশ তো মিডিয়াকে এরকম কিছু বলেনি? তুমি জানলে কী করে?

—এ ধরনের তথ্য সাধারণ জনতার সামনে এলে আরও অনেক প্রশ্ন উঠত, যার উত্তর দেওয়ার মতো তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না। এটাই আসল কারণ।

—কেন?

—প্রশ্ন উঠত কী এই মাইক্রোব? কে তৈরি করল এই মাইক্রোব? কীভাবেই বা সেই মাইক্রোবের পিছনে থাকা আসল খুনি মারা গেল? সে খুনিরই বা কেন কোনও ছবি প্রকাশ করা হল না? সে খুনির দেহই বা গেল কোথায়?

তন্ময় বলে উঠল—সেকি? তাহলে সে খুনি মারা যায়নি বলছ? বেঁচে আছে?

—না, না, আমি তা বলিনি। সেও মারা গেছে তার নিজের হাতে তৈরি ওই একই মাইক্রোবের হাতে। আসলে নিজের সৃষ্টি যখন নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন যা হয় আর কি? আর তাই তারও দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে তার কঙ্কাল। একইসঙ্গে ওই মাইক্রোবও ধ্বংস হয়ে গেছে স্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে।

—কে এই স্রষ্টা?

—গিল হারভে। আমার পুরনো বন্ধু, যার কথা তোমরা সংকেত রহস্যে শুনেছ। এখন অবশ্য তিনি সামনে এসেছিলেন ডেভ নাম নিয়ে।

—মানে?—বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। —সেই গিল হারভে যার সঙ্গে তোমার পেরুতে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। আর বলতে পারো আমাকে গিল ওনার উপস্থিতি জানানোর জন্যই একের পর এক এভাবে খুন করছিলেন। যাতে আমি ওনার আসল মেসেজটা পাই যে উনি কলকাতার বুকে একটা বড়সড় আঘাত হানতে চলেছেন। আগের বারের কথা ভুলতে পারেনি গিল। কিন্তু কলকাতার বুকে বড় আঘাত হানার আগেই ওনাকে মরতে হল ওনারই তৈরি মাইক্রোবের হাতে। আর আবার প্রমাণ হল যে আমাদের মধ্যেই ভিনগ্রহীরা আছে। যারা মানুষের ভালো চায়। বিপদের সময় আমদের রক্ষা করে।

—কারা তারা? তুমি পেরুর যে উপজাতির কথা বলেছিলে? তারা?

—ঠিক তাই। তবে এ ঘটনাটা টপ সিক্রেট। 'সেটি' জানে, বিশেষ কিছু লোক জানে। তাই এ ব্যাপারে এর বেশি কিছু কথা বলতে পারব না। আজ আমাদের বিচারে এই উপজাতি উন্নত নয়। তারা কোথায় ঠিক থাকে তা আমিও জানি না। কিন্তু তাদের হাতে এক বিশেষ অস্ত্র আছে। তা হল তাদের ভাষা। সংকেতের ভাষা, যার সাহায্যে তারা এখনও তাদের ভিনগ্রহী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারাই এবার আমাদের রক্ষা করেছে। গিলের মৃত্যু হয়েছে ওদেরই হাতে। গিল মারা না পড়লে কী হত বলা মুশকিল। এ ঘটনা শুধু কলকাতায় থেমে থাকত না, হয়তো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত। এ ধরনের মাইক্রোব টেররিস্টদের হাতে পৌঁছলে কী হত ভাবা যায়!

এখনও কি বিপদ আছে?

গিল তো আর একা কাজ করেনি। নিশ্চয়ই আরও লোক ছিল এর পিছনে। তাদের খোঁজখবর চলছে। এখনও এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রতীক বলে উঠল—আচ্ছা, ওই যে ম্যাথামেটিশিয়ান, অপরাজিতবাবু—তাকেও কি গিলই মেরেছেন?

—আমার তো তাই মনে হয়। ওনার পায়ে বিষ ইঞ্জেক্ট করে মারা হয়েছিল। কিন্তু ফরেন্সিকস ছাড়া এখন নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

—কিন্তু ওনাকে মারা হল কেন?

—অপরাজিতবাবুর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল ওই মাইক্রোব তৈরি করতে। পরে অপরাজিতবাবু গিলের ও গিলের টিমের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। হয়তো বাধাও দেন। কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে তখন মিথ্যে

অভিযোগ আনা হয়। সেটা এড়াতেই উনি ইংল্যান্ড ছেড়ে এখানে চলে আসেন। কিন্তু গিল জানতেন অপরাজিতবাবু কোনওভাবে পুলিশকে সবকথা জানিয়ে দিলে ওনার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই ওনাকে মারা হয়।

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল—এসব গন্ডগোলের মূলে অনিলিখা। অনিলিখার জন্যই কলকাতাকে এভাবে আক্রান্ত হতে হল। এর থেকে অনিলিখাকে ধরে নিয়ে গেলেই পারত। কিংবা দু-একটা মাইক্রোব অনিলিখার জন্য—

অনিলিখা হেসে বলে উঠল—শুধু আমি কেন! এখন তুমিও নিশ্চিন্ত নও! কে বলতে পারে তোমার ওই সিঙ্গাড়ার মধ্যে দু-একটা মাইক্রোব ঘোরাফেরা করছে না। এমনিতেও মাংস ওদের প্রিয় খাবার।

—সর্বনাশ—বিশ্বজিৎদা বিষম খেয়ে হাতের শিঙাড়া ফের প্লেটে রেখে দিল।

২০

ঘটনার পরে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে।

রাত ন'টা। অনিলিখার ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা বেজে উঠল। সামনে পুজো আসছে। চাঁদার জন্য কেউ আসতে পারে। কে এসেছে দেখার জন্য অনিলিখা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজা হাট খোলা। মালতী দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু বাইরে কেউ নেই।

এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে কেউ নেই দেখে মালতী অবাক হয়ে বলে উঠল—কেউ নেই দিদি। এই তো এখনই বেল বাজল। খুলতে-না-খুলতে চলে গেছে, কী তাড়া। কী সুন্দর 'শাশুড়িমা ভগবান' সিরিয়ালটা দেখছিলাম। বাকিটা আর দেখতে পেলাম না।—একটু থেমে ফের বলে উঠল—ও মা! কী আবার রেখে গিয়েছে দরজার কাছে লাল প্যাকেটে।

অনিলিখা দরজার কাছে এগিয়ে এল। বাইরে একটা গিফট প্যাক। কে যেন রেখে দিয়েছে। আস্তে করে তুলে নিল অনিলিখা। ঘরে এসে লাল কাগজে মোড়া গিফট প্যাকটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা ছোট কাঠের বাক্স। আর একটা ছোট চিঠি। কয়েকটা লাইন টাইপ করে লেখা শুধু।

অবাক হয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল অনিলিখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়—

আর খানিকক্ষণের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আবার দেখা হবে। অনেক কিছুই ঠিক অনুমান করেছ। কিন্তু যেটা ঠিক অনুমান করোনি, তা হল আমি আর ডেভ একজন নই। অবশ্য ডেভ আমার হয়েই কাজ করত। ডেভ চলে গেলেও আমি আছি। এ যাত্রায় ওই মাইক্রোবগুলোর উপরে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। কিন্তু এখনই যুদ্ধ শেষ হয়নি। আমার কাছে এরকম নতুন মাইক্রোব তৈরি করা শক্ত কিছু নয়।

তোমার জন্য বাক্সে উপহার রেখে গেলাম। তোমার প্রিয় পেরুর বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন। ওর হাতের এগোরোটা আঙুল।

ওদের ডান হাতে ছ'টা আর বাঁ-হাতে পাঁচটা থাকে। হয়তো আগে খেয়াল করোনি। দেখো এখানেও সেই মৌলিক সংখ্যা। পরের বার ওদের চিনতে তোমার সুবিধে হবে। আবার দেখা হবে।

গিল হার্ভে।

666।

